পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে দাঙ্গা- দেশভাগ-স্বাধীনতা-উদ্বাস্তু সমস্যা: নিবিড় পাঠ— “স্বাধীনতার স্বাদ” – ‘কেয়াপাতার নৌকো’ – ‘ নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে’

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে দাঙ্গা- দেশভাগ-স্বাধীনতা-উদ্বাস্তু সমস্যা: নিবিড় পাঠ—

"স্বাধীনতার স্বাদ" – 'কেয়াপাতার নৌকো' – ' নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে'

চল্লিশের দশকের যে ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালির জীবন ও সাহিত্যে সবচেয়ে প্রলম্বিত ছায়া ফেলেছে, সেটি হল দেশভাগ। দেশভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে দেশজুড়ে সংঘটিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ লাভ করেছিল খণ্ডিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা উপহার দিল গণ প্রব্রজনের বাধ্যবাধকতা আর উদ্বাস্তু সমস্যা। বাংলা ভূমি চিরকালের জন্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালি হিন্দু নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়ল। অস্তিত্বের সংকট থেকে বাঁচতে বাঙালি সুসলমান চলল পাকিস্তানে, আর হিন্দু বাঙালি পাড়ি জমাল পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে। এ এক সীমাহীন যন্ত্রণার আখ্যান। বাংলার সেই যুগসন্ধিহ্লণে বাঙালির বুকের রক্তহ্লরণকে ভাষা দিয়েছেন অনেক কথাসাহিত্যিক। আমরা তিনজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের তিনটি উপন্যাসকে নিবিড় ভাবে বিশে-ষণ করে সেই সময়ের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হব। একটি হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসটি। দ্বিতীয়টি প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' এবং তৃতীয়টি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে।"

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর সদ্য নির্বাচিত লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী ভারতের বড়লাট ওয়াভেলকে দিয়েই প্রকাশ্যে ঘোষণা করান, যে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়া হবে। যদিও ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায় নি। তারজন্য তাকে আরও দু'বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত অপেহ্লা করতে হয়েছিল। কিন্তু এই দু'বছর ভারতবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় নি। কেননা ইংরেজের

পহ্ল থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, হ্লমতা হস্তান্তর কীভাবে সম্পন্ন হবে তা ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছালেই তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু এই শর্তটি মানাই ছিল কঠিন। "কেননা স্বায়ত্ত শাসন কার হাতে দেওয়া হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতান্তর ছিল যথেষ্ট। তাছাড়াও তপশিলী সম্প্রদায় বিশেষত জগজীবন রামের মতো অনেকেই ব্রিটিশ শক্তির অবসান অন্তত তখনই চাননি। কারণ, তাঁরা ব্রিটিশ শক্তির পরিবর্তে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন। এছাড়াও ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসির ছত্রছায়ায় থাকা দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হ্লমতা হস্তান্তরের সময় হায়দ্রাবাদ, ভূপাল অথবা ত্রিবাঙ্কুরের মতো দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের জন্য পৃথক হ্লমতার দাবি জানায়। পাঞ্জাবের শিখরাও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের দাবি জানিয়ে জটিলতা তৈরি করে।"[১]

ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নিয়েই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। লিগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিকারী দল বলে দাবি করে। ওয়াভেলের ১৯ সেপ্টেম্বরের স্বায়ত্ত্ব শাসন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে লিগ ও কংগ্রেসের বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। লিগের ১৯২৯ সালের পেশ করা চোদ্দদফা দাবিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু , বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব এবং বাংলা সহ মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির জন্য প্রকারান্তরে পৃথক রাজনৈতিক স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছিল। আর ১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের এলাহাবাদ অধিবেশনে মহম্মদ ইকবাল তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি সুসংহত ও পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন।[২]

এদিকে মহম্মদ আলি জিন্না ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লিগের লাহোর অধিবেশনে ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পৃথক স্বাধীন রাজ্য গঠনের

প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরোধী কংগ্রেস লিগের প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়।

এই রকম জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে এক সারিতে নিয়ে এসে কত দ্রুত ভারতকে স্বায়ত্ত্ব-শাসন দেওয়া যায় তা স্থির করার জন্য সরকার বিলেত থেকে ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন ১৫ই মার্চ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ২৩ মার্চ ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, ভারতসচিব পেথিক লরেন্স এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার ভারতে আসেন। এঁরা মোট ৭৪২ জন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ১৮২টি বৈঠক করেন। এরপর সরকারেরর তরফে লিগ ও কংগ্রেসকে নিয়ে সিমলাতে একটি ত্রিপাহ্লিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এত কিছু পরেও কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে কোন মতৈক্য তৈরি করা যায় নি। এই অচলাবস্থায় ক্যাবিনেট মিশন একটি প্রস্তাব পেশ করে। যেটি ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মার্চ সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবটিই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা হিসেবে পরিচিত। "The three member commission produced a report on March 16, 1946, but the plan that they gave for the solution of Indian Political deadlock embodied a plea for the rejection of the demand for Pakistan. Pakistan, they argued, would not solve even the communal problem. The Cabinet Mission plan proposed a Federal Union of India with a scheme for grouping of Indian provinces into three groups, the groups B and C consisting of Muslim-majority provinces of the North-West and North-East India respectively. The National Congress wanted the grouping to a voluntary affair for every province, but the Muslim League demanded it to be compulsorily imposed on the relevant provinces. So that

there would be no scope for the National Muslim Leaders to play into the hands of the National Congress".[৩]

মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ প্রাথমিক ভাবে আপত্তি জানালেও মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ জুন এবং কংগ্রেস ২৫ জুন এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। তবে উল্লেখনীয় বিষয় হল, মূলত সংবিধান সভা বা Constituent Assembly গঠনের প্রয়োজনেই কংগ্রেস ও লিগ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লিগ রাজি হওয়ার পর সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য মিশনের প্রস্তাবমতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় লিগ হতাশ হয়ে পড়ে এবং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় তার দেওয়া সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয় ২৯ জুলাই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। লিগ এবার পাকিস্তানের জন্য পৃথক একটি সংবিধান সভা গঠনের দাবি জানায়। ক্যাবিনেট মিশন অন্তবর্তী সরকার গঠনের রীতিপদ্ধতি স্থির করে ১৬ জুন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে একটি বিবৃতি জারি করে। কিন্তু লিগ ও কংগ্রেসের আপত্তিতে এই প্রস্তাবও ভেস্তে যায়। উভয়পক্ষের অনমনীয় মনোভাবে বিরক্ত হয়ে ক্যাবিনেট মিশন শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। আর এর ঠিক একমাস পরে লিগ সরকারিভাবে মিশন পরিকল্পনা মানতে অস্বীকার করে। একই দিনে অর্থাৎ ২৯ জুলাই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে লিগ তার পৃথক পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪৬ —এর ১৬ আগস্ট Direct Action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে। যার ফলস্বরূপ ১৬-১৯ আগস্ট কলকাতায় এবং এর পরে নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যায়।

কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন 'প্রবাসী'(আশ্বিন ১৩৫৩), হিন্দু (৪ আশ্বিন ১৩৫৩) থেকে জানা যায়, "উত্তর কলকাতার মানিকতলা ব্রিজে সকাল ছটা

নাগাদ এক গোয়ালাকে মারধোর ও তার দুধের পাত্র ফেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটিকে ওই দিনের দাঙ্গার প্রথম ঘটনা বলা যায়। এরপর মানিকতলার 'দেশবন্ধু' মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আক্রান্ত হয়। স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে কিছু লিগ সমর্থক এই হামলা চালায়। বিবেকানন্দ রোড— আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে একটি শীতলা মন্দির ও কয়েকটি দোকান আক্রান্ত হয়। দোকান-বাড়ির ওপর হামলা নানা অঞ্চলেই শুরু হয়ে যায়। দোকানদারদের মারধোর ও ছুরি মারার ঘটনাও ভোর থেকেই চলতে থাকে। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন ঘটনাও বাড়তে থাকে। ..... দুপুরের মধ্যেই উত্তর কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতা থেকে লুঠপাট, ছুরি মারামারির খবর আসতে থাকে। মৃত বা আহত ব্যক্তিদের খোলা লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যা স্বাভাবিক ভাবেই মানুষকে উত্তেজিত করে।"[৪]

দাঙ্গায় ইট পাটকেল ছোঁড়া, ছুরিকাঘাত করা এমনকি বন্দুক নিয়েও মারামারি চলতে থাকে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে কার্ফু জারি হয়। ফলে রাতের জন্য সাময়িক সংঘর্ষ ও তাণ্ডব বন্ধ থাকে। দুপহ্লের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে দাঙ্গা আরও বীভৎস রূপ নেয় পরের দিন অর্থাৎ ১৭ আগস্ট। প্রথম দিন লুঠপাট বেশি হলেও পরের দিন ব্যাপক খুনোখুনি শুরু হয়। "১৭ আগস্ট ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দাঙ্গায় মারা যান ৩০০ মানুষ। দি স্টেট্সম্যানের' হিসাবে মৃত্যু হয়েছিল ২৭০ জনের।... ১৮ আগস্ট মৃতের সংখ্যা দুহাজারে পৌঁছে যায়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ২৩ আগস্ট হিসেব দেয়: মৃত ৪০০০, আহত ১১০০০, ২৮ আগস্ট এর সরকারি নোটে বলা হয় মৃত ৪৪০০, আহত ১৬০০০ এবং গৃহচ্যুত হন ১০,০০০ হাজার মানুষ।

চারদিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপহ্লে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নর-নারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। আহত-হয় ১৫০০০ এর মতো মানুষ। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অথবা লুঠ হয়। নারী অর্মযাদারও বহু ঘটনা ঘটে।"[৫]

২৩ আগষ্টের 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকা থেকে জানা যায় তখনও রাস্তায় গলিত মৃতদেহ পড়ে ছিল। সরকার মড়া সরানোর জন্য 'কর্পস রিমুভাল কমিটি' গঠন করে। নালা নর্দমা থেকে তখনও শব পাওয়া যেতে থাকে। ২৬ আগস্ট পর্যন্ত কলকাতার রাস্তা থেকে মোট ৩৪৬৮টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।"[৬]

কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র লাস পড়ে থাকতে দেখা যায়। লরিতে করে মড়ার গাদা নিয়ে যাওয়া সেদিন কলকাতার অনেক মানুষই প্রত্যহ্ল করেছেন। লরিতে করে মড়ার গাদা নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও গোরস্থানে মৃতদেহ স্তূপীকৃত করে রাখা হয়। জায়গার অভাবে যে গুলির সৎকার করা যায় নি।

মৌলানা আজাদ কলকাতার দাঙ্গার জন্য লিগ সরকারকে পুরোপুরি দায়ী করেছেন। আইন পরিষদে বিতর্কের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা করে ফজলুল হক বলেন,"কোথায় কখন গোলমাল হবে পুলিশ যদি না বুঝতে পেরে থাকে, তাহলে তাদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে কেন?" আনিসুজ্জমান আরও রূঢ় ভাষায় মন্তব্য করেন : "আমরা দেখিয়াছি ময়দানে সভায় যাইবার জন্য মিছিলকারী ও লিগওয়ালারা ছোরা ও লাঠি সহ সশস্ত্র হইয়া অবলীলাক্রমে রাস্তায় উভয় পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা আরো দেখিয়াছি, সশস্ত্র পুলিশ ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে। অনিসুজ্জমানের কথায় "একথা প্রত্যেক নিরপেহ্ল সজ্জন ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে দাঙ্গার জন্য মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী।"

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'টাইমস' পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিল যে, লিগ সরকার হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রহ্লার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। কলকাতার 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা লেখে এই দাঙ্গা ছিল মুসলিম লিগের রাজনৈতিক হ্লমতার প্রদর্শনী: a political demonstration of the Muslim League.[৭]

কলকাতা দাঙ্গার লেলিহান শিখা অচিরেই ভারতের বিরাট অংশকে গ্রাস করল। কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ, বরিশাল, ও পাবনা প্রভৃতি জেলায় ছোট বড়ো দাঙ্গা হয়। নোয়াখালি দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় আবার বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়। এভাবে অশান্ত ভারতবর্ষে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের দাঙ্গায় হাজার হাজার লোকের প্রাণহরণ হয়। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের দাঙ্গায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত হিসাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ১৭ হাজার মানুষ। সময়সীমা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টেনে পাঞ্জাবের হিসাব যোগ দিলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১লহ্ল ৮০ হাজার। ৬০ লহ্ল মুসলমান, আর ৪৫লহ্ল হিন্দু, এবং শিখ বাস্তুহারা হয়েছিলেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব নিলে সংখ্যাটি আরো বেশ কয়েক লহ্ল বাড়বে। প্রায় ২০ লহ্ল হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন এই সময়ের মধ্যে। এই হিসাবও সম্পূর্ণ নয়। কারণ ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় মৃতের পুরো হিসাব পাওয়া যায় নি। অমৃতসর থেকে লাহোর বা লাহোর থেকে অমৃতসর কখনও কখনও পুরো একটা ট্রেনই এসেছিল মৃতদেহ বোঝাই হয়ে। দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক মহারণের মূল্য দিয়েই কেনা হয় হ্লমতার 'শান্তিপূর্ণ'হস্তান্তর। "About 5000 had been killed by August 1947, but even this proved just a curtain-raiser to the war of extermination which began after independence on both sides of the border, when refugee train sometimes arrived carrying only dead bodies. Penderel Moon estimates that approximately 1,80,000 had been killed, of which 60,000 were from the west and 120,000 from the east. By March 1943, six million Muslims and four and a half million Hindus and Sikhs had become refugees."[৮]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতেই অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ব্রিটিশ বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে শুরু করে। ১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করেন, ১৯৪৮

খ্রিস্টাব্দের জুনের মধ্যেই ভারতে হ্লমতা হস্তান্তর করা হবে। ১৯৪৭ এর ২২ মার্চ মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানো হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন সর্বদলীয় বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের প্রস্তাব পেশ করলে তা অনায়াসেই গৃহীত হয়। দাঙ্গাই এই পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিল। দেশভাগের পহ্লে কংগ্রেস ও অকালী দল লিখিত সম্মতি জানায়। লিগের পহ্লে জিন্নার সম্মতি ছিল মৌখিক। ৩ জুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী হাউস অফ কমনসে ভারত ভাগের কথা ঘোষণা করেন। ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্য ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব দিয়েছিল, ভারতের নেতারা তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়াতে দেশভাগ অনিবার্য বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৮ জুলাই ইংল্যাণ্ড থেকে সিরিল র‍্যাডক্লিফ এসে পৌঁছান। দেশভাগের জন্য মাউন্টব্যাটেন তাঁকে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় দেন। নেহেরু ও জিন্না ব্যাপারটা আরো দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে চান। বাংলা ও পঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্য দুটি বাউণ্ডারি কমিশন হয়।

সীমানা কমিশন ভূগোল এবং জলবিন্যাস সম্পর্কে কোনো ধারণা ব্যতিরেকেই লাইন টেনে ভাগ করেছেন ভারতবর্ষকে। এর পরিণামে হ্লত বিহ্লত হয় দেশ; অগণিত নর-নারী এপার থেকে ওপারে চলে যান। অসংখ্য মানুষ ওপারের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসেন এপারে। প্রায় দুলহ্ল মানুষের প্রাণ যায়। লাঞ্ছিতা হন গণনাতীত সংখ্যক নারী। লহ্ল লহ্ল মানুষ উদ্বাস্তু হয়। হত্যা, রক্তপাত,নারীহরণ আর নির্যাতনের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবাসী লাভ করে এক খণ্ডিত স্বাধীনতা। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১ দিন আগে। এই ভয়াবহ ঘটনা উপমহাদেশের পহ্লে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েছিল।

পূর্বভারতে বিশেষত ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং হাজার হাজার গৃহচ্যুত ও স্বজন হারানো আহত মানুষগুলির কথা ও সাতচল্লিশের বঙ্গবিভাগ ও ভারতে ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষদের দুঃখ দুর্দশার ছবি

বাংলা কথা সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায় না বলে অনেকে হ্লোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথা বলা যায় পাঞ্জাবি ও উর্দুর মতো দাঙ্গার প্রত্যহ্ল ও প্রকট বাস্তবতার ছবি না থাকলেও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দাঙ্গা ও দেশভাগ এসেছে নানাভাবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এবং প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাস তিনটির আলোচনার মাধ্যমে চল্লিশের সেই উত্তাল সময়ের ছবি বাংলা সাহিত্যে কীভাবে খোদিত হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করব।

২

১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 'স্বাধীন' হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েকবছর আগে থেকে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে থাকে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসটি কলকাতার বুকে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে যে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধে— সেই দাঙ্গার পটভূমিতে কলকাতার বিধ্বস্ত নগরজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম ছিল 'নগরবাসী'; গ্রন্থরূপে প্রকাশের সময় পরিবর্তিত নাম হয় 'স্বাধীনতার স্বাদ'।

মানিকের এই উপন্যাসটি সময়ের দলিলবিশেষ। প্রধানত দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতা শহরই কাহিনির মূল পটভূমি ছিল বলে প্রথমে 'নগরবাসী' নাম হয়েছিল। কিন্তু এই পর্বটি ছিল ব্রিটিশ শাসকের ষড়যন্ত্রে বাঁধানো বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও কাল। কলকাতার রাস্তায় তখন অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের লাশ। দেশভাগের রাজনীতি তখন ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তাই আসন্ন স্বাধীনতা কোনো স্থায়ী আনন্দ বা শান্তির সম্ভাবনা যে নিয়ে আসছে না সেটা

দেশবাসীর কাছে ক্রমশ সুনিশ্চিত হয়ে উঠছিল। এই স্বাধীনতার আস্বাদ হবে তিক্ত এবং রক্তাক্ত— নামকরণের মধ্যে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

মানিকের এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লেখা আছে, 'সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম— জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।' "উৎসর্গপত্রের এই ভাষাও লেখকের এই পর্বের মানসিকতাকে স্পষ্ট করে। এই উপন্যাস কেবল দাঙ্গার চিত্র নয়, সমস্ত ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে যে চিরন্তন মনুষ্যত্ব তার প্রতিই লেখকের গভীর আস্থা। এই কথা মাথায় রেখেই তিনি ঘটনা সাজান, চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেন। স্বভাবতই এর ফলে উপন্যাসে কিছুটা ডকুমেন্টেশন আসে, আসে তত্ত্ব এবং তথ্যের ভিড়। দাঙ্গা যারা করে এবং দাঙ্গার যারা শিকার — উভয় পক্ষই উপন্যাসে তাদের বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়। দাঙ্গাকারীরা শেষপর্যন্ত দাঙ্গা প্রতিরোধকারীর ভূমিকায় নামে। অধিকাংশ চরিত্রের কাছে ধর্ম অপেক্ষা মনুষ্যত্বই বড়ো হয়ে ওঠে।"[৯]

দারুণ গুমোট করা বর্ষার দুপুরের একটি চিত্র দিয়ে উপন্যাসটির শুরু। অজানা আশঙ্কা, ভয় তাড়িত দুরু দুরু বুকে অলক্ষ্য মৃত্যুর একটি ছায়াহীন হাতছানি যেন চারিদিকে! — থমথমে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক প্রাকৃতিক রূপকে আঁকেন ঔপন্যাসিক প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ গুলিতে 'শ্মশানপুরীর মতো চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম, জনহীন রাজপথ। কদাচিৎ দু-একটি গাড়ি সচল শঙ্কার মতো হুস পার করে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ক্রমাগত এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুতপদে হেঁটে চলেছে দু-একজন পথিক। চারিদিকে ভয়, জমজমাট কৃত্রিম আতঙ্কে। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসে। সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও টের পাওয়া যায় তীক্ষ্ণ কুৎসিত হিংসার ধার।"[১০]

এমনই দাঙ্গা-হিংসা কারফিউ কবলিত শহরের নিস্তব্ধ বিধ্বস্ত আতঙ্কিত পরিবেশে মধ্য ভারতের এক বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র থেকে দাঙ্গা কবলিত কলকাতায় ভাগ্নীকে নিতে এসে

দাঙ্গাক্রান্ত হয়ে মারা যান মামা প্রমথ। তার সঙ্গে ছিল প্রণব। কোনরকমে মণিদের বাড়িতে গিয়ে দাদা সুশীলকে খবর দেয়। ভাগ্নী মণিমালা এমন মৃত্যুতে দারুণ শোক পায়। কিন্তু পরিস্থিতিই এমন যে দাঙ্গায় মৃত্যুও যেন অভ্যস্ত জীবনেরই অঙ্গ হয়ে গেছে। তাই প্রমথ'র নিথর দেহটা একতলায় চাদর ঢাকা পড়ে থাকলেও সাংসারিক আলাপ আলোচনা চলে। তবু রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারে না কখন মৃত্যু আসে, আসে ধ্বংসের তাণ্ডব এই ভেবে। "আগের দিনের সে ঘরোয়া সুখ দুঃখ অবশ্য আর অবশিষ্ট নেই, বাইরের বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনোজলের মতো জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের জীবন। .... সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গাহাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কিনা জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কিনা জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়। বাড়ির সকলে একত্রে উদ্‌বেগ-আতঙ্কের পল গুণে সময়ক্ষেপ করে, উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার, হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।"[১১]

মানিক ইতিহাসের পটকেই অনাবৃত করেছেন। ৪১-৪২ এর যুদ্ধ, পরে ৪৩-৪৪ এর মন্বন্তর, এর পর স্বাধীনতার প্রসব বেদনাকালে কলকাতা শহর প্রত্যক্ষ করেছে অসংখ্য অপমৃত্যু-অসংখ্য শব। নগর কলকাতার জীবনস্পন্দের অঙ্গ হয়ে পড়েছে বেওয়ারিশ লাশ। এই হন্তারক দশকের পটচিত্র আজকের পাঠককে বিমূঢ় করে তোলে।

উপন্যাসটিতে চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে পরিবেশ তৈরির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে বেশি। চরিত্রগুলি তাতে সাহায্য করেছে মাত্র। প্রণব ও তার বৌদি মণিমালার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে

তাদের পরিবার ও জীবনযাত্রার কথা জানা যায়। জানা যায় যে প্রণব বৈপ্-বিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার জন্য তার সরকারি কলেজের অধ্যাপক দাদা সুশীল 'পুলিশের ভয়ে' সপরিবারে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য মণিমালা যৌথ পরিবারে বসবাস করলেও স্বাধীনতা খুঁজছিল। পুলিশ স্বদেশি প্রণবের বাড়ি সার্চ করলে সেই অজুহাতে তারা সংসার থেকে পৃথক হয়ে এই বাড়িতে উঠে আসে। চার-পাঁচ বছর পর প্রণব এসেছে এই বাড়িতে। তার মনে হয়, ভিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে ঘরকন্না গড়ে তুলতে গিয়ে মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেছে মণির। অবশ্য একসময় সুশীলরা পণ করেছিল প্রণবের সঙ্গে তারা থাকবে না কারণ সে রাজনীতি করে। অবশ্য 'স্বদেশি ছেলে স্বদেশি ভাইয়ের শুধু বাপ-ভাই হওয়ার জন্য কেন, আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব হওয়ার জন্যও এদেশে অনেকের ভাগ্যে কম লাঞ্ছনা জোটেনি।"[১২] পারিবারিক আখ্যানে এভাবেই ঝলকে ওঠে ইতিহাস। মণির ছেলে মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। ছেলে সুধীন এখন কলেজে পড়ে আর মেয়ে আশা ষোলয় পা দিয়েছে। শহরে তখন ছত্রিশ ঘন্টার কারফিউ। সেজন্য প্রণবকে সেদিন থেকে যেতে হয় ওখানে। হঠাৎ শোনা যায় চীৎকার 'আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে।' ছাতে ওঠে দেখা যায় বড় রাস্তার ওপারে সামান্য দূরে বস্তিতে আগুন ধরেছে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সুশীলকে বলে, "দুপুরে গলির ভেতর এসে তিনজনকে সাবাড় করে দিয়েছিল না, এই তার জবাব দেওয়া হল।"[১৩] প্রণব কোলকাতার এদিকটা ভলোমতো না চিনলেও অনুমান করে "ওটা মজুরবস্তি নয়। মজুররা এ দাঙ্গায় নামে নি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুনও লাগতে পায় না, পালা করে দল বেঁধে তারা পাহারা দেয়।"[১৪] পরদিন প্রমথর দেহ সংক্রান্ত হাঙ্গামা মিটিয়ে মণিদের প্রণব তাদের পুরোনো বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বহুদিন পর মণি এখানে এসে পুরনো দিনের কথা ভাবতে থাকে। এখন এ বাড়িতে মানুষের ভীড়ে এসে শুরু হল মণির নতুন জীবন। আরো জনা কুড়ি নারী-পুরুষ আশ্রিত বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে; সে যেন এক আনন্দের হাটে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয়। ধরাবাঁধা

পারিবারিক নিয়মের বাঁধুনি এ বাড়িতে চিরদিনই শিথিল, — "এ যেন খেয়ালখুশির হাটে এসে পড়েছে মণি— কী খাবে, কোথায় শোবে, কী করে একটু আড়াল পাবে কারও তা নিয়ে মাথাব্যাথা নেই, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা এবং সেটা অকাতরে মেনে নেওয়া যে তাই সই, তাই সই!"[১৫]

মণিদের জন্য তারা একটি ঘর খালি করে দেয়। সেই ঘর আগে ছিল নীলিমা এবং গিরীনের। গিরীন একটি ইংরেজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। এই দাঙ্গার সময়েও কাল্লু, রহমতের মতো মিস্ত্রীরা হিন্দু পাড়ায় থেকে যায়। প্রণবের ছাতে টিনের চালা তৈরি করে দেয় কাল্লু। মাল-মসলা দুষ্প্রাপ্য হলেও প্রণবদের পাড়ার বাসিন্দা কন্ট্রাক্টর মাধববাবুকে কনট্রাক্ট দিলে সে তিন মাসে তেতলা দালান তুলে দেবে। কিন্তু সেজন্য কাল্লু, রহমতের দরকার আরও লোকের। ওই পাড়ারই বস্তিতে এরা কয়েকঘর বাস করে। সংবাদ পত্র অফিসের চাকুরে গিরীন বাড়ি ফেরে, কিন্তু সারাদিন চারদিক থেকে দাঙ্গার এত খবর আসে যে, মনটা বিষন্নতায় ভরে থাকে, রাত্রে ঘুম হয় না। "খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সংবাদ গুলি কেটে ছেঁটে চেলে নিতে প্রতিদিন যে সমগ্র তাৎপর্য পাওয়া যায় তা শুধু অশুভ ইঙ্গিতের, মারাত্মক সম্ভাবনার। সহজে সর্বনাশা দাঙ্গার আগুন নিভবে, সহজে দেশজোড়া বিহ্লোভের মীমাংসা হবে, কল্পনা করাও অসাধ্য হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।"[১৬]

কবি মনসুর ও গিরীন, মনসুরের একটি কবিতা "কালের কথা" মাসিক পত্রের সম্পাদকের অফিসে পৌঁছে দিতে যায়। এদিকে ফটিকচাঁদলেনেই ঘটে গিয়েছিল বীভৎস বিপর্যয়, যা খবর হয়ে খবরের কাগজের অফিস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি সকালেও। "সে ঘটনার সঠিক বর্ণনা হয় না, ভাষায় তার রূপায়ণ নেই। পাশের এক পাড়া থেকে এসেছিল সংগঠিত আক্রমণ, অন্ধকারের সেই গোপন অভিযানের সেনাপতি ছিল এই এলাকার ছত্রপতি কলকাতার এক বিখ্যাত গুণ্ডারাজ।"[১৭] দলবল নিয়ে জনতাকে হত্যা, লুঠপাট পরিচালনার

এমন সুযোগ আগে আর আসে নি। ফকিরচাঁদ লেনের কতগুলি বাড়ি থেকে বার বার টেলিফোন করেও পুলিশ বা ফৌজ আনানো যায় নি। এখানেই আক্রান্ত হন কবি মনসুর। তিনি মারাত্মক জখম হলেও প্রাণে বেঁচে যান। এই দাঙ্গা সুস্থ মানুষকেও বিবেকহীন করে তোলে। মনসুরের স্ত্রী রশৌনাও বাড়ি বয়ে এসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ঘৃণার সঙ্গে মনসুরের ওই অবস্থার জন্য নীলিমাদের দায়ী করে। তার বিশ্বাস গিরীনরাই ছলনা করে মনসুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এই দিনে মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল।

ট্রাম, বাস চলে, কোথাও হাঙ্গামা হলে একবেলা বা দু-এক দিনের জন্য বন্ধ হয়, আবার চলে। কখনো কখনো ড্রাইভারের পাশে থেকে অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী। অনেক মোড়েই রাইফেলধারী পুলিশ, মিলিটারি ট্রাকের যাতায়াত। তবুও অ্যাসিড ছোঁড়া, ছুরি মারা, লুঠপাট চলতেই থাকে। নিরাপত্তা কমছে। শঙ্কা বাড়ছে। শহরবাসী তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। লেখক খুব স্পষ্টভাবেই একটি সত্যকে তুলে ধরেছেন, "দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে! হায়রে তামাশা!"[১৮]

দাঙ্গা হাঙ্গামার রাজত্বে সর্বত্র এখন জাল-জুয়াচুরি। রেশনের দোকানে পর্যন্ত। এখানকার রাজা হোল গুণ্ডারা। শহরের এই অঞ্চলের গুণ্ডাসর্দার হোল সুবোধ কুমার সিংহ,- "সুবোধ সিংহ একা মানুষ তার বিয়ে-করা বউও নেই, আইনসঙ্গত বাচ্চাকাচ্চাও নেই। কিন্তু তার তেত্রিশখানা রেশন কার্ড। সাথি অনুগতদের সে একশোর উপর বাড়তি কার্ড বিতরণ করেছে। প্রত্যেকটি কার্ড রেজিষ্ট্রি করা।"[১৯]

বাড়িতে একদিন চাল ছিল না। তাই মণি সুশীলকে তার বন্ধু চাল চোরাকারবারী যতীনের কাছে পাঠায়। সুশীল যতীনের কাছ থেকে দু-মণ চাল এনে দিলেও বাড়ির লোকেরা সেই চাল পেয়ে খুশি হয় না। এভাবে চোরাকারবারীর কাছ থেকে চাল কেনাকে তারা ঠিক মনে করে না। সুশীলও এইভাবে তার অজান্তে যতীনের খপ্পরে পড়ে যায়। রাত্রে প্রণবদের

বাড়িতে রোজই আসর বসে। সেখানে সারাদিনের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। তবে তার মধ্যে রাজনীতিই বেশি; এই আসরেই দুটি নতুন মুখ, দুই তরুণ বামপন্থী কর্মীকে দেখা যায়। এদের একজনের নাম মনোমোহন তার কাছে পূর্ববঙ্গের ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে যেন সকলে মূক হয়ে যায়। সাধারণ লোক দাঙ্গা করে না। আসলে তাদের দিয়ে করানো হয়। কারণ "সাধারণ মানুষকে আজও কমবেশি ভোলানো যায় খ্যাপানো যায়, কিন্তু সহজে, সস্তায় না ভুলবার, না খেপবার ঝোঁকটাই বেশিরকম জোরালো। আজ তাদের একটা যুদ্ধে নামাতে পৃথিবী জুড়ে ওলটপালট ঘটনার মতো বিরাট ব্যাপার ঘটাতে হয়। ধর্মের নামে জাতের নামে একটা ছুতো দেখিয়ে ডাক দিলেই মানুষ আর যুদ্ধে নামে না। দাঙ্গা করে না। যুদ্ধ বাধাতে হিটলারদের কী মহামারি কাণ্ড করতে হয়েছিল মনে নেই? দুশো বছরের গদি আপসে ছেড়ে দিতে না চেয়ে ইংরেজের সাধ্য ছিল না এরকম দাঙ্গা বাঁধায়।"[২০] তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আবার "মজুর শ্রেণি সবচেয়ে বেশি দাঙ্গাবিরোধী"।[২১] কারণ নীচের তলার মানুষেরা একাকার, মিলটাই তাদের সবচেয়ে বড়ো স্বার্থ– তবু দাঙ্গা হচ্ছে।' কারণ শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিতে স্নাত লেখকের মতে বাঁচার স্বার্থে নীচের তলায় হিন্দু-মুসলমান একাকার। "নামাজ পড়ে পুজো দিয়ে তো মানুষ বাঁচে না, বাঁচে বলে নামাজ পড়ে, পুজো দেয়। ভেদ যা আছে সব ওপর থেকে চাপানো, কত জন্ম ধরে পায়ের তলায় পিষে মারছে, পেটের ধান্ধায় কাবু, তার ওপর হাজারটা কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, এদের ভুল বোঝানো কি কঠিন? তবু, একটু চেতনা এলেই আর ভেদ চাপানো যায় না। চোখের সামনে প্রমাণ আছে দ্যাখো। মজুররা মারামারি করছে না। এখনও যে এই শহরে ট্রামে চেপে বেড়াও, হিন্দু-মুসলমান মিলে ওই ট্রাম চালাচ্ছে।"[২২] কমিউনিস্ট লেখকের বিশ্বাস, শ্রমিক শ্রেণির মানুষ , নীচের তলার মানুষ দাঙ্গা করে না। আধিপত্যবাদ তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, দাঙ্গা লাগায়। যে দাঙ্গা শুরু হয়েছে তা চাপানো দাঙ্গা, ওপরওয়ালাদের স্বার্থে। তারা গরিবদের, নীচুর তলার মানুষকে

"পৃথিবীতে বেঁচে থেকে ভাতকাপড়ের সুখ পেতে হলে এটা করা চাই ই, এ বিশ্বাস জন্মিয়ে তবে সাধারণ লোকের একটা অংশকে দাঙ্গায় মাতানো গেছে।..... হিন্দু মুসলমান যারা পরস্পরকে শত্রু ভাবছে যে ওরা আমার ধর্মের পথের কাঁটা, তাদেরও সত্যি সত্যি এটা আসল চিন্তা নয়। এ আদর্শবাদে মত্ত হওয়ায় আসল কারণও বাঁচা-মরার সমস্যা। যে মুহূর্তে ভুল ভাঙ্গবে, টের পাবে যে বাঁচার পথের কাঁটার চাষটা শুধু ওপরতলায় হয়, সেই মুহুর্তে শত্রু-মিত্র চিনতে পারবে।"[২৩] মার্কসবাদী লেখকের সাধারণ মানুষের ওপরে গভীর বিশ্বাসের কথা ধ্বনিত হয়েছে। সেই আশা নিয়েই কাজ করে যেতে হবে। আর ওপরতলার মানুষদের স্বার্থে ঘা লাগলেই তারা ক্রমাগত বাধা দেবে। সেইজন্যই গিরীনদের কাগজে দাঙ্গাবিরোধী প্রচার হয় বলে তাদের পত্রিকা অফিসে আক্রমণ করা হয়েছিল।

একদিন খবর আসে ওদের পাড়ায় ইয়াসিন এসেছিল। "ইয়াসিন অন্য এলাকার শক্তিশালী গুণ্ডারাজ বা গুণ্ডানবাব!"[২৪] সে এবং সুবোধ সিংহ চৌরঙ্গীর বড়ো হোটেলে খানা পিনা করেছে এবং নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করেছে। লেখক যেন বলতে চান ওপরতলায় নেতা, মন্ত্রী মায় গুণ্ডাদের মধ্যেও রয়েছে পারস্পরিক বোঝাপড়া। আর এদিকে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধু নেতা নিয়ে মন্ত্রী মিশন নিয়ে, দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেস-লিগ কমিউনিস্ট নিয়ে মেতে আছে। তারা যেন জীবনের গতিকে অস্বীকার করে, জীবনের সাধ-আহ্লাদ, সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে দিনরাত খালি দেশ আর সমাজ, সাম্রাজ্যবাদ আর স্বাধীনতা, বিপ্-ব আর সমাজতন্ত্র নিয়ে জপ করছে।

একজন সামান্যা গোবর কুড়ানি বৃদ্ধা নানীকেও মেরে ফেলা হয়। সকালে মন্দিরের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা নানীর রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর মন্দিরের কোলাপসিবল গেটে লটকে থাকে কাটা গরুর মুণ্ডু। মাকে খেতে না দিলেও মায়ের অপমৃত্যুতে নাজিম বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিয়ে আসে। বস্তি আর বস্তির ওপারের মুসলমান প্রধান এলাকার অনেকেই

চলে আসে। নাজিম হাঁটু গেড়ে মায়ের ধূলায় লুণ্ঠিত দেহটার পাশে বসে মায়ের মুখটা উচুঁ করতে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সোডার বোতল তার মাথা ফাটিয়ে মায়ের রক্তের সঙ্গে তার রক্ত একাকার করে দেয়। সঙ্গে যোগ হয় গরুর রক্ত। শুরু হয় দাঙ্গা। ঝকঝকে ছুরি ঢুকে যায় কারও পাঁজরে। অ্যাসিড বাল্‌বে ঝলসে যায় হিন্দু-মুসুলমানের দেহ। লাঠির ঘায়ে কাবু হয় অনেকে। রসময় পুলিশকে ফোন করে কিন্তু পুলিশ আসে না। তাদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। " ঘরের কোনে খেলার ঝোঁকে সাতবছরের ছেলে বন্দেমাতরম্ বললে যারা শুনতে পেয়ে তাকে শায়েস্তা করে"[২৫], তারা দাঙ্গার বেলায় কিছু শুনতে পায় না। যখন সব কাজ শেষ হয়ে যায়, বহুলোক হতাহত হয়, লুঠপাট হয়, চোরা বাজারের পেট্রল এনে ঘরে ঘরে ঢেলে আগুন দেওয়া হয়ে যায়। তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে মিলিটারি আসে, আর পথের নিরীহ মানুষদেরকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে। এই দাঙ্গার পেছনের আসল উদ্দেশ্যকে চিনিয়ে দেন লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপে। গিরীন বলে "উপায় কি বলুন? যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি"[২৬] দেশের এই দুর্দিনে কংগ্রেস-লিগ ইংরেজরই পহ্ল নিয়েছে। তারা আসলে ইংরেজদের শত্রু নয়, বিপহ্ল। 'ইংরেজ এদেশে বিপহ্ল গড়তে দিয়েছে, কখনও শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে— দ্বীপান্তরে পঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠছে। এখন বিপহ্লরাই ইংরেজের ভরসা। চারদিক লাখ লাখ শত্রু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নৌসেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন"[২৭]— এসে হাজির হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় তাবেদারদের খেলায়, কিন্তু ভয় পায় সংগ্রামী চেতনাকে। মানিক দেখেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দেশীয়রূপ দেখেই সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন পাঠিয়ে তড়িঘড়ি স্বাধীনতা ঘোষণার পথে হাঁটছে। তাই গিরীন বলে—"স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছুকালের জন্য ঘুচে গেল, যে পথে এত দুর এগোলাম সেই পথ আগুনের প্রাচীর

তুলে বন্ধ করে দিলাম— এটাই আমার সবচেয়ে বড়ো জ্বালা। নইলে হিন্দু মুসলমান কয়েকশো বছর ধরে এদেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান থাকতাম— তাতে আমার এত কষ্ট হত না। রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াইয়ে দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড়ো খারাপ। শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয় নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়েছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দুটো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে। প্রাণ দিতে হবে।"[২৮]

ভবিষ্যদ্রষ্টা লেখকের কণ্ঠে সর্বনাশা রাজনীতির ধর্মীয়করণের বিপজ্জনক দিকটি ধ্বনিত হয়েছে। যার বিষফল এই একুশ শতকেও ফলে চলেছে।

মণিরা এসব কথা ঠিক বুঝতে পারে না। যেমন পারে না ঘরের মধ্যে আবদ্ধ তার মতো লহু লহু মা বোনেরা। শিহ্লার আলো যাদের কাছে নিষিদ্ধ। এর জন্য লেখক বিদেশি ইংরাজ সরকারকেই দায়ী করেছেন। শতাব্দীর অন্ধকারে দু একটি বিশ্ববিদ্যালয়রূপী চোখ ঝলসানো আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে এতদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে শুধু ভাঁওতা দিয়ে এসেছে। আর "জীবনের মান নামিয়ে এনেছে একটানা শোষণে, মিলিটারি বুটের লাথি আর জগতের সেরা ব্যবসায়ী মাথার কৌশলে জীবনের রূপান্তর ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে বিংশ শতাব্দীর এই মাঝামাঝি পর্যন্ত।"[২৯]

ধর্ম যেন উভয়পক্ষেই নিছক পোশাকি চরমতায় উঠে গেছে। তাই পোশাকি একটা আবরণ থাকলেই দাঙ্গার এলাকার মধ্যেও যে কোনো পাড়াতেই চলাচল করা যায়। "তুমি যে হিন্দু কিংবা তুমি যে মুসলমান বাইরে তার একটা চিহ্নধারণ করে, একটা গান্ধীটুপি বা ফেজ মাথায় চাপিয়ে, হত্যার জন্য উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দু বা মুসলমান পাড়ায় তুমি অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পার।"[৩০] পথে যতহ্লণ সম্ভব ট্রাম, বাস, মানুষ চলাচল করে। দোকানে কেনা বেচা

হয়, অফিস চলে, কারখানা চলে, সিনেমা চলে, রেডিও বাজে, বস্তিতে মানুষ বাঁচে, অভিশাপ দেয়। বিরাট মহানগরীর বিপুল জনসাধারণ এভাবেই দাঙ্গাকে সয়ে চলে। কিন্তু জীবনকে সস্তা হতে দেয় না। এর কয়েকদিন আগেও লহু লহু মানুষ না খেয়ে মরেছে হিন্দু মুসলমানের বাংলায়। ঘটে যাওয়া দুর্ভিহ্ল ও চলতি দাঙ্গা সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা লহ্ল করা যায় এই উপন্যাসে ঃ "দুর্ভিহ্ল দিয়ে পঁয়ত্রিশ লহ্লকে হত্যা করা হল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে, ওটা-হল কৌশলে হত্যা করা। কৌশলটা ধরি-ধরি করেও সাধারণ মানুষ ধরে উঠতে পারে নি। কিন্তু ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে রাজপথে ছোরা মেরে হত্যা চলতে দেবার অসংগতি জনসাধারণ অনুভব করে। তাই এরকম হত্যা ঠিক যতটুকু চলতে দিয়েও মোটামুটি বাঁচা যায় শুধু ততটুকু হত্যাই শহরে সম্ভব হয়েছে।"[৩১]

উপন্যাসে দেখি স্বাধীনতা চেয়েছে প্রণব, স্বাধীনতা চেয়েছে মণি; কিন্তু দুজনের আকাঙ্হ্লা দুরকম। মণি অশিহ্লিতা, শান্ত সরল গৃহবধু আর প্রণব শিহ্লিত, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। মণির নিজের ওপরেই ঘৃণা হয়। তার মনে হয় সে আসলে অন্ধকারের জীব। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয় তার, ঘরের কোণে থেকে তার মনে কতগুলো দুর্বলতা, সংকীর্ণতা জন্মেছে। সেই জায়গা থেকে মুক্তি চেয়েছে মণি।

শহরে শেষপর্যন্ত দাঙ্গা বিরোধী শান্তি কমিটি কাজ শুরু করে। নাজিমের আফসোস, তার লজ্জা বুড়ি মাকে খেতে না দেওয়ার জন্য নয়। লোলচর্ম, বৃদ্ধা মাকে গুণ্ডার হাতে নৃশংসভাবে মরে যেতে দেওয়ার জন্য। পাড়ার লোক ও অন্যান্য অনেকে নাজিমের মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বলে। মাতৃহত্যার বীভৎস রূপটা তার মাথার মধ্যে ধিক্ ধিক করে জ্বলতে থাকে। এদিকে গুণ্ডা ইয়াসিন তাকে ডেকে পাঠায়। নাজিম যেন পৌরুষের স্বাদ অনুভব করে।

কিন্তু এই নাজিমের অনুভূতিই ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। তার মুখ থেকে দুর্গা অন্য

এক ধর্ম কথা শোনে— "জগতে হিন্দু ও নেই মুসলমান ও নেই, আছে শুধু বড়লোক আর গরিব লোক। জগতে আছে শুধু গুণ্ডা আর তাদের শিকার লহু লহু কুলি মজুর। বাস খতম। ঈশ্বর আল্লা তাদের নয়, স্রেফ ধনী আর গুণ্ডাদের ঈশ্বর আল্লা।"[৩২] এই দাঙ্গার পিছনে, এই খুনোখুনির পিছনে কি কারসাজি আছে, কাদের কারসাজি আছে— তা এখনো না বুঝলে গরিব মানুষকে হাড়ে হাড়ে টের পেতে হবে। "তাদের কত খুন, কত জান দিয়ে কারা কী বাগিয়ে নিল। তাদের নসিবে কী জুটল। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসি বড়োবাবুরা আর লিগের বড়ো সায়েবরা উপর তলায় মরিয়া হয়ে খেলছে আপস লড়াই আদায়-নিকাশের ব্যবসাদারি খেলা। খেটেও যারা খেতে পায় না তাদের জাতধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড়ো চাল, মজুর চাষি, গরিব খেপে গেছে, খেপে গেছে জাহাজের দেশি ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসি বড়োবাবুদের, লিগের বড়োসাহেবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর,চাষি, গরিব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের হুমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ তাকে সাগর পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা হবে গরিব খাটুয়ের- সর্বনাশ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায়-নিকাশের ঘরোয়া আপস ভালো। দাঙ্গা হল এই আপসের একটা দর-কষা কষি। ইংরেজের সেরা চালবাজি।"[৩৩] সমকালীন ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশে-ষণ 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসটিকে ইতিহাসের, ঔপন্যসীকরণের পাশাপাশি ইতিহাসের বিশ্লেষণী ভাষ্য হিসাবে এক স্বতন্ত্র উচ্চতায় দাঁড় করায়। দাঙ্গার পিছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত আর কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কুটিল রাজনীতির বিষয়ে লেখক স্পষ্টভাষায় জানাতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাই নাজিমের পর এই সভায় এক বৃদ্ধ যার ছেলে সেদিন দুধের অভাবে মারা গেছে সে বক্তৃতা দিতে ওঠে। সে বলে— "মোর বাচ্চাটা তো মোল, মোকে এসে বলে কী, তোর ওই ছেলেটাকে দে, মরা ছেলেটাকে দে, টাকা পাবি! মরেই তো গেছে, কী করবি ছেলেটাকে দিয়ে? মোদের কাজে

লাগবে, দিয়ে দে, মাথাটা ছেঁচে, গা কাটাকুটি করে দশজনকে দেখাবে দাঙ্গা বাধাবে। শুনলে? মোর মরা বাচ্চাটাকে ছেঁচে কেটে দাঙ্গার উসকানি দেবে? না ভাই, হিঁদু-মোছলমান এক না দুই জানি না বাবা, দাঙ্গায় মোদের কাজ নেই। দাঙ্গা মোরা করব না, বাস! ওদের দাঙ্গা ওরা করুক।"[৩৪] শান্তি কমিটির বৈঠকে নাজিমদের এই হৃদয় বিদারী বক্তৃতা যেন সব গরিবকে এক আসনে, এক বিশ্বাসে স্থির করছে।

মার্কসবাদী লেখকের লেখনীতে অতি সহজেই চলে আসে মুটে মজুর খেটে খাওয়া মানুষের দল। বামপন্থায় বিশ্বাসী মানিক তাই সহজেই শান্তি মিটিং এ দেখান কারাখানা ফেরত মানুষেরা, যারা বাজারে সওদা করতে আসে তারা দলে দলে জমায়েতে ভিড়ে যায়। দেখতে দেখতে দু তিনশো মানুষের ছোট সভাটা হয়ে দাঁড়ায় হাজার মানুষের জমায়েত। লেখকের উক্ত-মানসিকতা প্রকাশ পায় এই বর্ণনায়—" জোর বাতাসে গ্যাসের আলোটা নিবু নিবু হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে। তিনটি লাল ঝাণ্ডা উড়ছে পতপত করে, আশা উৎসাহ আত্মবিশ্বাসের জোয়ার আসছে মানুষের মনে। ভয়াবহ রক্তাক্ত ফাঁকির কবল থেকে এখানে আজ মুক্তি ঘোষণা।"[৩৫] বক্তৃতা দেয় একজন ভিন্ন প্রদেশের মুসলমান মজুর। হিন্দু-মুসলমান নয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল মজুর এক। শুধু দাঙ্গা না করলেই চলবে না, দাঙ্গা রুখতে হবে, সমবেত জনতা মোহিত হয়ে পড়ে। সায় দেয়, সাড়া দেয় তার কথায়। এই সভা পরিণত হয় শোভা যাত্রায়। অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বনি ওঠে, "হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই। দাঙ্গা চাই না রুজি চাই; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। আপসকারীরা ব্রিটিশের গোলাম, মোদের খুন ওদের শরবত....."[৩৬] এই সব সভা শোভাযাত্রার চিত্রে ৪৬ এর দাঙ্গায় বামপন্থী কর্মীদের নেতৃত্বে শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের ইতিবাচক ভূমিকার ঐতিহাসিক দলিল।

এই সভা, এই শোভাযাত্রা শহরকে আরো কয়েকটি ছোট খাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। "বাজারের কাছে শান্তি কমিটির সভার খবর শুনে উদ্যত আক্রমণকারীরা মুখ

চাওয়াচাওয়ি করল, এ এলাকায় লরি-বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ এসেছে শুনলেও তারা এতটা ভড়কে যেত না। জমায়েত যখন শোভাযাত্রায় পরিণত হল, তারা তখন অস্ত্র আর পেট্রোলের টিন গোপন করে ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। মানুষ সমবেত হয়ে বজ্রকণ্ঠে শুধু ঘোষণা করছে, শান্তি চাই। সে আওয়াজ শুনেই অবশ হয়ে গেছে গোপন হিংসার ছোরা-ধরা হাত— শিকার ধরতে ওঁত পাতা বাঘ দল বাঁধা মানুষের সাড়া পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে ইটের জঙ্গলের গোপন অন্ধকারে।'[৩৭] বাংলাদেশের মানুষ এমনকি কমিউনিস্ট পার্টি ও গান্ধী-জিন্না বৈঠকের উপরে আশাবাদী ছিল। তারা ভেবেছিল এর দ্বারাই সমস্যার সমাধান হবে। তারা ভেবেছিল স্বাধীনতা মানে জগতের মানুষের মুক্তি। কিন্তু লেখক মানিক ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি তাই প্রণবের মুখ দিয়ে বলান " আমার মনে হয়, আমরা ভুল করছি। গান্ধী-জিন্না আপস চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছি। ওই স্তরে আপস হবেও না সে আপসে সাধারণ মানুষের লাভও নেই। গরিব খাটুয়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি আছে, ওটাই মিলনের আসল ভিত্তি করা উচিত। কংগ্রেস- লিগ মিলন নয়। কংগ্রেস-লিগ -ব্রিটিশ এই তিন পহ্ল আপস হতে পারে, কংগ্রেস-লিগ আপস হবে না। ব্রিটিশের আপস আদরে কংগ্রেস-লিগ দু ভাই লায়েক হয়েছে, সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেরা লাঠালাঠি করতে পারে। ব্রিটিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশকে বাতিল করতে তো পারে না।.... ওদের পলিসির ফলে এই দাঙ্গা, ওদের মধ্যে আপস চাওয়া মানেই এই ব্রিটিশের ফরমাশি পলিসি সমর্থন করা।"[৩৮] প্রণবের কথা হল, সাধারণ মজুরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ ওপর তলায়। কলকাতার মজুরদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো যায়নি। গেলে তো আরো ভয়াবহ হতো। গোকুল ও বলে,"উপলতলার নীতি থেকে দাঙ্গা বেঁধেছে। কিন্তু উপরতলায় দাঙ্গার প্রতিকার নেই। নেতাদের মর্জির উপর নির্ভর করে আমরা সাধারণ খাটুয়ে মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"[৩৯] গোকুল মণিকে বোঝায়, আসল বিষয়ে তাদের সবার মত এক এবং তারা তাদের

লড়াইকে হিন্দুত্ব মুসলমানত্বের উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায়। "শুধু ইংরেজ নয়, কংগ্রেস আর লিগের হাত থেকেও দেশকে রহ্লা করতে হবে।"[৪০] কারণ হিসেবে গোকুল স্পষ্ট করেই বলে,"কংগ্রেস বা লিগ সেরকম স্বাধীনতা চায় না যা মজুর-চাষি সাধারণ লোককে স্বাধীন করবে। ইংরেজের সঙ্গে আপসে ওরকম স্বাধীনতা মিলতেই পারে না। নইলে ইংরেজের ভারত ছাড়া নিয়ে এত মারামারি কেন? এত শর্ত কীসের? বিদেশি তোমরা ভাগো, আমাদের যা হবার হবে, আমরা বুঝব- এই একটিমাত্র শর্ত ছাড়া স্বাধীনতা খাঁটি হয়? ফাঁকির স্বাধীনতা, তাই নানারকম শর্ত নিয়ে দরদস্তুর।"[৪১] আসলে "হ্লমতা পাওয়ার মধ্যে ফাঁকি আছে। সত্যিকারের হ্লমতা মানেই জনসাধারণের হ্লমতা, ধর্মের নামে হ্লমতা ভাগাভাগি নিয়ে জনসাধারণ মারামারি করে না। উপর তলার একদল লোক দেশ শাসনের নামে. কিছুটা হ্লমতা পাবার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ভেজাল স্বাধীনতা কিনছেন। আপসে দরদস্তুর করছে তারাই। দেশে আগুন জ্বলেছে, সৈন্যরা পর্যন্ত বিদ্রোহী, সোজাসুজি এ দেশের ঘাড়ে চেপে বসে রক্ত শোষার সাধ্য আর ইংরেজের নেই। তাই প্রত্যহ্ল স্বাধীনতা দিয়ে পরোহ্ল দাসত্বে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা চলছে। সে ব্যবস্থা মেনে নিয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে কংগ্রেস আর লিগ।"[৪২] এই মত গোকুল, প্রণবের , এই মত বামপন্থার, সর্বোপরি এমত লেখক মানিকেরও।

দেশভাগ হয়ে যাবে, দেশের দুটো টুকরোর প্রত্যহ্ল শাসনের সুযোগ পাবে কংগ্রেস আর লিগের প্রধানেরা। সময় ঘনিয়ে এসেছে। জল্পনা-কল্পনা আর পরিকল্পনার জোয়ার এসে তা বন্যায় পরিণত হয়েছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা রূপ নিয়েছে ওলট-পালটের। এই ওলট-পালট, উদ্বেগ, ঝঞ্ঝাটে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য স্মরণ করার মতো। "মুখ ম্লান হয়ে গেছে স্থান ও স্তানের হিন্দু ও মুসলমানের। যে মারাত্মক আত্মহননের মধ্যে জন্মেছে স্থান ও স্তান, কে জানে এই ভাগাভাগিতেই তার ইতি কিনা?"[৪৩] ভাগভাগিতেই যে ইতি হবার নয় নরকযন্ত্রণার।

দাঙ্গার দিনে শ্রমজীবী মানুষের যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রত্যহ্ল করল ৪৬ এর কলকাতা, আমরা দেখেছি, কিছুদিনের মধ্যে সেই মৈত্রীসূত্র ও ছিঁড়ে গেছে। ইতিহাসের এ এক নির্মম ট্র্যাজেডি।

অনেকে ফেলে যাওয়া বাড়িতে ফিরে আসছে। বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় বস্তিবাসীরা সেভাবে ফিরতে পারে নি। হাসপাতাল থেকে গিরীন জেলে গেছে। সরস্বতীর মা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। গোকুল বলে, সত্যিকারের স্বাধীনতা না পেলেও তা আসছে। একদিন না একদিন মানুষ সত্যিই স্বাধীন হবে, "কদিন আর লাগবে এ স্বাধীনতা তিতো হতে, দেশের লোকের চোখ খুলতে? যাদের গর্জনে ব্রিটিশ পিছু হটেছে, আবার তাদের গর্জন শোনা যাবে হিন্দুস্থানে, পাকিস্তানে— সত্যিকারের স্বাধীনতা চাই।"[৪৪] কিন্তু প্রণবের মতে দুশো বছরের কুয়াশার অন্ধকার এত তাড়াতাড়ি কাটবে না। সঙ্কট বাড়বে, বঞ্চিত হতে হতে স্বাধীনতার কামনা দিন দিন বাড়বে। ঊষারা বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখে সেখানে স্বাধীনতার সমারোহ চলছে; মণিরাও পুরানো বাড়ির দিকে যায়।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় এত বিশাল ঝড় ঝঞ্ঝার পরে এক শান্ত সমাহিত রূপ। এত কিছুর পরেও স্বাধীনতা এসেছে এটাই স্বস্তির। তবুও উপন্যাসটি পড়ার পর বার বার একটি জিজ্ঞাসা মনে আসে তা হল, স্বাধীনতার পরেও এত হানাহানি কেন? আর তখনই মনে হয় মণিকে বলা গিরীনের কথা, "দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি। স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদাজল খেয়ে দুটো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে।"[৪৫] একজন কথাসাহিত্যিক বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ৪৬-৪৭ এর দাঙ্গাও স্বাধীনতাকে নির্মোহ বিশে-ষণ করেছেন এই উপন্যাসে। যে সংশয়, যে জিজ্ঞাসা তিনি উপন্যাসে রেখেছেন, সে জিজ্ঞাসার আজও মীমাংসা হয় নি, দেশভাগ এর হ্লত থেকে চুঁইয়ে রক্ত ঝরেই চলেছে বাঙালির ভুবনে, নানা গর্বে, নানা পরিমাণে। ঋষিতুল্য লেখকের

ভাষ্যে যে বিপন্নতার ইশারা— বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সে বিপন্নতাই কালে কালে বাঙালির বিশ্বের চিরস্থায়ী হুতি হয়ে উঠেছে।

৩

দেশভাগও উত্তরকালের সমস্যা নিয়ে প্রফুল্ল রায়ের কলম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সৃষ্টি করে চলেছে। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকো'র নিবিড় পাঠে প্রবৃত্ত হয়েছি। উপন্যাসটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে, দ্বিতীয়পর্ব ১৯৭০ সালে এবং তৃতীয় পর্ব ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং অখণ্ড প্রকাশ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। এই এপিক ট্রিলজিতে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ মোট প্রায় দশ বছরের বাংলার ঘটনাপ্রবাহ বিধৃত। গ্রন্থটির উপক্রমণিকায় লেখকের আহ্লেপ প্রকাশিত হয়েছে প্রখ্যাত কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথন কালে। বাংলা সাহিত্যে কীর্তিমান লেখকদের রচনাতে দেশভাগ, দাঙ্গার ছবি সেভাবে পাওয়া যায় না। তিনি বলেছেন "দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো বাঙালি জীবনের এমন ভয়াবহ বিপর্যয় তাঁদের লেখায় কেন যে ব্যাপকভাবে দেখা যায় নি তা নিয়ে আমার যথেষ্ট আহ্লেপ ছিল। নারায়নদা পূর্ববাংলার মানুষ।..... তাঁকে বড় আকারে এই বিষয়ে একটি উপন্যাস লেখার আর্জি জানিয়েছিলাম। নারায়ণ দা বলেছেন, অনেক কাল আগে দেশ ছেড়ে এসেছেন। পূর্ব বাংলা তাঁর স্মৃতিতে যতটা আছে অনুভূতিতে ততটা নেই।" তাই লেখক নিজেই "দেশ হারানোর যন্ত্রণার অনুভূতি থেকে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিপর্যয় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জীবনে সংকট, সংশয় ও ছিন্নমূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার জের আজও অব্যাহত। বাঙালির সেই সীমাহীন জীবন সংকট ও সংগ্রামের কাহিনি 'কেয়াপাতার নৌকো।'

কিশোর বিনুর চোখ দিয়ে আমরা সেই বিপর্যয়ের দিনগুলিকে দেখি। উনিশশো চল্লিশ

সালের অক্টোবর মাস,বাংলার তেরশ সাতচল্লিশের আশ্বিন মাসের এক কুয়াশা ভেজা ভোরে উপন্যাসের শুরু। তখনো চারধারে আবছা অন্ধকার, স্টিমারে ডেকে এসে দাঁড়িয়ে বিনু, বিনুর বাবা অবনীমোহন, বিনুর দুই দিদি সুনীতি ও সুধা। বিনুর মা সুরমা অসুস্থ রুগ্ন, তাই তিনি বাইরে আসেন নি, কেবিনে শুয়ে আছেন। বিনুর বাবা অবনীমোহনের বয়স পঞ্চাশের কাছা কাছি, সুরমা চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, সুনীতির বয়স একুশ, সুধার আঠারো আর বিনুর বয়স বারো।

কলকাতার ভবানীপুরের বাড়ি থেকে অবনীমোহন চলেছেন পূর্ববাংলার ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী রাজদিয়ায়। কলকাতার কিশোর বিনু অবাক হয়ে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সমস্ত উপন্যাসটি কিশোর বিনুর অনুভূতির কোণ থেকেই রচিত। গোয়ালন্দ থেকে রাজদিয়াগামী স্টিমার, ধলেশ্বরী নদি, মাঝিদের বিচিত্র কথাবার্তা বিনুকে অবাক করে দেয়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় বিনু, শরতের নীল আকাশ আর বর্ষার জল ও গ্রাম্য ভূ-প্রকৃতিকে দেখে, "মধ্য ঋতু এই শরতে খালগুলো কানায় কানায় ভরা। তবে স্রোত নেই। নিস্তরঙ্গ স্থির জলে কোথাও কচুরিপানা, কোথাও নলখাগড়ার বন মাথা তুলে আছে আর আছে ছোট ছোট নৌকো। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাঁশের সাঁকো-মাছরাঙ্গা আর বক চোখে পড়ছে। ফুলভর্তি হিজল গাছে শালিক বসে আছে অনেক।"[৪৬]

সুরমার মামা হেমনাথ মিত্র রাজদিয়াতো বটেই, আশে পাশের গ্রামের জীবনের সঙ্গেও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাদের সুখ-দুঃখ ঝগড়া-ঝামেলা, বিবাদ নিরসনে সর্বদা তৎপর তিনি। আর হেমনাথের জীবনে তাঁর সুখ-দুঃখের অংশীদার লারমোর সাহেব—এক মিশনারি। পূর্ববঙ্গকে ভালবেসে এদেশেরই মানুষ হয়ে গেছেন তিনি। বিনা পয়সায় মানুষজনের চিকিৎসা করেন লারমোর। হেমনাথ ও তাঁর স্ত্রী স্নেহলতার কোনো সন্তান নেই। তাঁরা প্রতিবছর সুরমা ও অবনীমোহনকে আসার জন্য চিঠি লেখেন। প্রতিবারই অবনীমোহন পুরী,গিরিডি, দেওঘর এ বেড়াতে চলে যান সপরিবারে। অবশেষে তাঁরা ট্রেন স্টিমার ও ফিটনে চেপে রাজদিয়া পৌঁছান।

এরপরই যেন সপরিবার অবনীমোহন পূর্ববঙ্গকে আবিস্কার করেন। নগরজীবন ছেড়ে এসে পূববর্ঙ্গের পল্লী প্রকৃতিকে দেখার আনন্দ, রূপসী বাংলার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। রাজদিয়ায় এসে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মনোরম দৃশ্য দেখে নতুন করে সুজলা সুফলা বাংলাকে চিনেছেন অবনীমোহন। ঔপনাসিকের কিশোরবেলার নস্টালজিয়ায় পাঠকও মোহিত হয়ে পড়ে। অবনীমোহনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও মনে হয় পূর্ববাংলাকে না চিনলে বাংলাদেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সকল হৃদয়বান মানুষ, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্পর্ক, পূজা-পার্বণ, লৌকিক আচার সব মিলিয়ে পূর্ববাংলাকে অবনীমোহনের অসাধারণ মনে হয়।

হেমনাথ ও অবনীমোহনের কথা-বার্তায় জানা যায় ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অবনীমোহনের কথায় জানা যায় যে "অবস্থা খুব খারাপ মামাবাবু। পরশুর আগের দিন রাত্তির থেকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট আর এয়ার রেইড প্রিকশানের মহড়া চলছে। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব"।[৪৮] এছাড়া কলকাতার রাস্তাতে সারাদিনই মিলিটারি গাড়ির আনাগোনা। আর হেমনাথের মনে হয়েছে "ওয়ারটা যদি ইউরোপেই আটকে থাকত, মন্দের ভালো। নিজেরা কাটাকাটি করে মরত, আমরা দূরে থেকে দেখতাম কিন্তু তাতো হচ্ছেনা। আগুন একেবারে দরজার সামনে এসে পড়েছে। ..... এদেশে খুব দুর্দিন আসছে অবনী, খবই দুর্দিন"।[৪৮]

হেমনাথের সঙ্গে থাকে ছোট্ট মেয়ে ঝিনুক। মা বাবার বিচ্ছেদের ফলে সে হেমনাথের আশ্রয়েই থেকে যায়। আর বিনুর সঙ্গে আলাপ হয় হেমনাথের বাড়ির পরিচারক যুগলের। বিনুর কাছে যুগল কলকাতার গাড়ি ঘোড়া রাস্তাঘাট, তার আয়তন প্রভৃতি জেনে নেয়, আর বিনু যুগলের হাত ধরেই চিনে নেয় পূর্ববঙ্গের সৌন্দর্যময়ী নিসর্গকে।

পূর্ববাংলায় অবনীমোহনের অবাক হওয়ার পালা যেন থামতেই চায় না। পূর্ববাংলার প্রকৃতি যেমন তাঁকে মুগ্ধ করে তেমনি মুগ্ধ করে হেমনাথ ও মজিদ মিএহ্লার ভালোবাসা ও

বোঝাপড়া। মজিদ মিএহ্লা কম দামে অবনীকে ধানের জমি দিয়ে দেয়, আবার হেমনাথ মজিদ মিএহ্লার সঙ্গে একাসনে বসে ভোজন করেন পরমাত্মীয়ের মতো। ব্রাহ্মণ, শুদ্র, বৈশ্য, হিন্দু মুসলমানের অনৈক্যের যুগে মজিদ মিএহ্লার সঙ্গে হেমনাথের সম্পর্ক দেখে অবাক অবনীমোহন। লেখকের বক্তব্য "বিকেলবেলা ভবতোষ গাঢ় বিষাদের ছায়া নিয়ে এসেছিলেন। মেঘের পর রৌদ্রঝলকের মতো মজিদ মিএহ্লা এ বাড়িটাকে আবার আলোকিত করে গেছে।"[৪৯]

রাজদিয়ার শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে অবনীমোহন আলাপ করেন হেমনাথের হিন্দু মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে। অবনীমোহনের মতো বিনুও চমৎকৃত হয় এক টাকায় ছ'টা ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে দেখে। স্টিমারঘাট পেরিয়ে নৌকোঘাট, সেখানে মানুষের চলাচল, সব মিলিয়ে পূর্ববাংলার প্রকৃতি দেখে মোহিত হয়ে যায় বিনু, আর পথে চলতে চলতে অবনীমোহনের সঙ্গে আরো অনেকের আলাপ করিয়ে দেন হেমনাথ। চালের ব্যবসাদার অধর সাহা, পাদ্রি ডেভিড লারমোর — যিনি আর্য়াল্যাণ্ড থেকে এসে রাজদিয়াতেই থেকে গেছেন। চল্লিশ বছর ধরে আছেন পূর্ববাংলায়। বিনা পয়সায় মানুষের চিকিৎসা করাই এখন তাঁর ব্রত, এরই মধ্য দিয়ে কিশোর বিনু বড়ো হয়ে ওঠে। সুরমা ও অবনীমোহনের কথোপকথন থেকে বিনু জানতে পারে যে তার বাবা অবনীমোহন আর কলকাতায় ফিরবেন না, রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন। ধানজমি কিনে চাষ বাসে মন দেবেন, — "তখন থেকেই উত্তেজনায় আনন্দে বিনুর বুকের ভেতরটা দুলতে শুরু করেছে। আদিগন্ত ধানের খেত, জলপূর্ণ প্রান্তর, পাখির ঝাঁক, লারমোর, হেমনাথ, যুগল, দ্বীপের মতো ভাসমান গ্রামগুলি, সুজনগঞ্জের হাট, যাত্রার আসর — সব একাকার হয়ে এই স্নিগ্ধ শ্যামল দেশ বিনুকে একেবারে জাদু করে ফেলেছে। এদেরকে ছেড়ে যেতে হলে ভয়ানক কষ্ট হতো তার।"[৫০] অবনীমোহনও তাঁর ছেলের মতোই প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত। রাঢ় অঞ্চলে তাঁর বাড়ি, কলকাতাতেই কাটিয়েছেন জীবনের এতগুলি বছর। বিয়ে করেছেন পূর্ববাংলার মেয়েকে। এতকাল পর তিনি এখানে এসে

বাংলাদেশের এমন একটা স্নিগ্ধ মনোরম রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি কল্পনাও করেননি "রাঢ়ে যে বাংলাদেশ রূঢ়-কর্কশ - কঠিন, সেই বাংলাই এখানে সুজলা সুফলা, ঐশ্বর্যময়ী শস্যে স্বর্ণে আর অনন্ত সম্ভাবনায় তার ভাণ্ডার এখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কড়ি আর কোমলে মেশা বাংলার কত না রূপ!"[৫১]

অবনীমোহনের পূর্ববাংলাকে আপন করে নেবার সংকল্প, তাঁর সৌন্দর্য মুগ্ধতার অবসান, সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনি পাই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের টানপোড়েনে পড়ে পূর্ববঙ্গের রূপ কী ভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে তা দেখতে পাই। ১৯৪২ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যে দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর জন্য বিনু নিজেও কিভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে তার বিবরণ রয়েছে দ্বিতীয় পর্বে। যুগান্তরের পালাবদল, রাজনৈতিক অভিঘাতের ফলে রাজদিয়ার শান্ত সুখী জীবন তছনছ হয়ে যাচ্ছে তা এখানে দেখানো হয়েছে।

গিরিগঞ্জের হাটে ধানচালের অভাব দেখা দেয়। নদীর পাড় ঘেঁসে থাকা সারি সারি আড়ত গুলো তালা বন্ধ। গিরিগঞ্জের বাজার থেকে ধান চালের দোকান লুট হতে শুরু করে। উপন্যাসে দেখি, সেই থেকে অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হতে থাকে। চালের মণ আঠারো থেকে বিশ টাকা হয়ে যায়। তারপর খাদ্যশস্য উধাও হয়ে যায়। গ্রাম্য জীবন ও পারিবারিক জীবনের স্নেহবন্ধন সম্পর্ক ও আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে হিরণ সুধাকে বিয়ে করে কলকাতাতে চলে যায়। সুনীতিও আনন্দকে বিয়ে করে কলকাতায় চলে যায়। হেমনাথ, সুরমা, স্নেহলতা ও অবনীমোহনরা আশা করেছিলেন সুধা সুনীতিরা রাজদিয়াতেই থাকবে। যে অবনীমোহন গ্রাম্য জীবনের মোহে কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন এবং সংকল্প করেছিলেন রাজদিয়াতে থাকার, তিনিও সুরমা মারা যাওয়ার পর আদর্শভ্রষ্ট হয়ে চাষবাস ছাড়লেন। গ্রাম জীবন ছাড়লেন, যুদ্ধে সাপ্-ইয়ের কাজ নিয়ে তিনি আসামে চলে গেলেন। মানুষের সেবায় যে মানুষটা মনপ্রাণ ও সারাটা জীবন আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই লারমোরসাহেবকে শেষ

জীবনে বিদেশির গ্লানি নিয়ে চলে যেতে হল। দাঙ্গায় তিনি প্রাণ দিলেন তাদেরই হাতে, যাদের জন্য তিনি আজীবন নিঃস্বার্থভাবে সেবাব্রতে ব্রতী ছিলেন। হেমনাথের বাড়ির সকলের আস্থাভাজন যুগল, যে কিশোর বিনুকে গ্রামজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে রঙিন করে তুলেছিল, হাত ধরে সমস্ত সৌন্দর্যকে অনুভব করতে শিখিয়েছিল, সে ভাটির দেশের গিরিগঞ্জের গোপল দাসের মেয়ে পাখিকে বিয়ে করে শ্বশুরের দেশে চলে গেল। হেমকত্তা একদিন দশখানা গ্রামের অভিভাবক ছিলেন। সবাই তাঁকে মানত। হেমকত্তার একান্ত অনুরাগী মজিদ মিএহ্লা অবনীমোহনকে বিনামূল্যে জমি দিতে চেয়েছিল। জমি নিয়ে দুই মুসলমান ধনী চাষী হেমকত্তার সালিশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন সে সব দিনকাল বদলে যায়। উপন্যাসের প্রথম পর্ব জুড়ে থাকা হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক ধীরে ধীরে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় পরিণত হয়। গ্রামে গঞ্জে শোনা যায় পার্টিশন হবে। বুধাই পালের মুখে শোনা যায় "মাইনষের মুখে শুনি, খবরের কাগজেও লেখছে, দ্যাশখান নিকি ভাগাভাগির কথা হইতে আছে। একখান ভাগ হিন্দু, একখান মুসলমানের।"[৫২] ব্রিটিশ সেনাদের শিবির পড়ে রাজদিয়ার নদীর ধারে। শুরু হয় দুর্ভিহ্ল, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাকারবারের দিন। সাধারণ মানুষের দুর্দশার শেষ থাকে না। গ্রামের সরল মানুষেরা চরিত্রভ্রষ্ট হয়, লোভের শিকার হয় ব্যাপারী আর চাষিরা। মিলিটারিদের সাপ্লাইয়ের কাজ শুরু করে রজবালি। এমন কি হেমকত্তার নির্দেশ অমান্য করে সে ধান চালের চোরাকারবারও শুরু করে। আর কেরোসিনের চোরাকারবার শুরু করে সুচাঁদ। নিত্যদাস তো হেমকত্তার নির্দেশ না মেনে মদের দোকানও খুলে বসে। লেখক এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে কিভাবে বাংলার সমাজ বদলে যেতে লাগল, তার এক বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন।

স্কুলে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীহ্লার সময় জানা যায় জার্মানরা বার্মায় বোমা ফেলেছে। রেঙ্গুনের পতন হয়েছে, কলকাতা থেকেও লোক পালাতে শুরু করেছে। অবনীমোহন এবং

হেমনাথও এ সংবাদে উদ্বিগ্ন। এদিকে ঢাকা থেকে মুসলিম লিগের নেতারা মীরকাছিম এসে সভা করে। তাতে বলা হয় "মুছলমানগো লেইগা একখান দ্যাশ চাই। তার নাম পাকিস্তান। তেনারা আরও কইল, যেহানে যত মুছলমান আছে হগলের লিগে নাম লিখান দরকার।" বাজার থেকে চিনি কেরোসিন উধাও হয়। দলে দলে লোক যুদ্ধে নাম লেখাতে শুরু করে। ১৯৪৬ এর ষোলোই আগস্ট সারা দেশ জুড়ে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। ঢাকাতেও শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভবতোষ হেমনাথের কোন কথা না শুনে ঝিনুককে নিয়ে তাঁর কর্মস্থান ঢাকায় চলে যান। ষোলো-সতেরো দিন পরেও না ফেরায় হেমনাথ ভবতোষ ও ঝিনুকের খোঁজে ঢাকা গিয়ে তিন দিন পরে ঝিনুককে নিয়ে ফিরে আসেন। "কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু। চোখের দৃষ্টি স্থির, উদভ্রান্ত গালে-ঠোঁটে-হাতে সমস্ত শরীরে কত জায়গায় যে মাংস উঠে রক্তারক্তি হয়ে আছে। পরনের জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোনও রাহুল যেন তার শরীরের সার শুষে নিয়েছে।"[৫৩]

হেমনাথের কথা থেকে জানা যায় ঢাকা পৌঁছে ভবতোষ দাঙ্গায় পড়ে। ঘাতকের দল ভবতোষকে মেরে ফেলে ও ঝিনুককে নিয়ে যায়। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিশ দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেন। ঝিনুক ধর্ষিত হয়। কিন্তু ভবতোষের মৃতদেহের সন্ধান পান নি।

স্বাধীনতার অব্যবাহিত পূর্বের প্রেক্ষাপটটি লেখক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। মুসলিম লিগের প্রবল আক্রমণাত্মক ভূমিকা, দাঙ্গা, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত- পাকিস্তান বিভাগের বাতাবরণটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গেই এসেছে। "প্রায় রোজই খবর আসে মুসলিম লিগ এ গ্রামে ও গ্রামে, এ গঞ্জে সে গঞ্জে এবং নদীর চরগুলোতে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। চারদিকে দাঙ্গাও চলছে। হত্যা আর্তনাদ, হল্লা, আগুন ইত্যাদি ছাপিয়ে বহুকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়। লড়কে লেঙ্গে-পাকিস্তান— পাল্টা উত্তরও ভেসে আসে, বন্দে মাতরম—'.... ভারতবর্ষের ভাগ্য একদিন স্থির হয়ে গেল।.... সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট

তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলা হবে। এক ভাগ হবে পাকিস্তান। আরেকভাগ আবহমান কালের পুরনো নামটাই ধরে রাখবে— ভারত।[৫৪]

হেমনাথ, মজিদ মিএহ্লা, মোতাহার হোসেনরা তবু বিশ্বাস করেন দেশভাগ হবে না। কিন্তু দেশভাগ হল। রজবালির দলই জিতল, হেরে গেলেন মজিদ মিএহ্লা, মোতাহার হোসেনরা। "মোতাহার সাহেব দেশবাসীর উপর ভরসা রেখেছিলেন, তারা দেশভাগ বন্ধ করবে। জননীর মতো গরিয়সী এই জন্মভূমির দেহে ছুরি বসাতে দেবে না।"[৫৫] কিন্তু দেশভাগ আটকাতে কোনো মানুষ এগিয়ে আসে নি। সবাই তখন দিশেহারা। স্রোতে গা ভাসিয়ে ভেসে চলেছে। কিছু মানুষের হা হুতাশ রোধ করতে পারে না দেশভাগ। 'শেষপর্যন্ত দেশজোড়া রক্তাক্ত সুতিকাগারে সেই দিনটি ভূমিষ্ঠ হলো। পনেরই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। খণ্ডিত দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।"[৫৬] মোতাহার হোসেনের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের মানুষ 'পার্টিশান' হতে দেবে না। তাঁর মতে "দেশের মানুষ নেতাদের এই হঠকারিতা কিছুতেই কোনও মতে মেনে নেবে না।"[৫৭] কিন্তু দেশভাগ আটকানো না গেলে মোতাহার সাহেব হ্লুব্ধ কণ্ঠ বললেন— "দেশভাগই যদি মেনে নেওয়া হলো, আগে মানলেই হত। এত রক্তারক্তি, এত দাঙ্গা, এত হত্যা ধর্ষণ আগুন কোনওটাই ঘটত না।"[৫৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা সাতপুরুষের ভিটেমাটিতে আর নিরাপদে বাস করতে পারল না। প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন রকম আক্রমণ, প্রাণহানি, নারী নির্যাতন ইত্যাদির ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়— গত দু বছর ধরে মাঝে মাঝেই দাঙ্গা বাধছে। দেশভাগ হয়ে গেছে, চোদ্দ পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে।"[৫৯] জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি ফেলে প্রাণটুকু নিয়ে কাতারে কাতারে হিন্দুরা বেরিয়ে পড়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ফলে স্টিমারঘাটে দিনরাত অষ্টপ্রহর থিকথিকে ভীড়।' স্টিমারও হয়ে পড়েছে অনিয়মিত। কিন্তু — যখনই

আসুক কয়েকশ উদ্বাস্তু তুলে নিয়ে গোয়ালন্দ যায়। এদিকে ভিটেমাটি ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ আসছে, আসছেই। ভীড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বিশ শতকের সবচাইতে বড় 'হিউম্যান ট্র্যাজেডি' এই দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। এতে প্রাণহানি হয়েছে লহ্ল লহ্ল মানুষের। প্রফুল্ল রায় এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিভাবে হিন্দুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, তার একটি বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন।

এক বিদেশি মহিলার অভিজ্ঞতায় "এই শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। প্রাণহানি হয়েছে লহ্ল লহ্ল মানুষের, কিন্তু ভারতবর্ষের বিভাজন তার চেয়ে এতটুকু কম ভয়াবহ নয়। পৃথিবীর এই গোলার্ধে জাতি দাঙ্গায় কত জনের মৃত্যু হয়েছে, সীমান্তের এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে কত লহ্ল মানুষ চলে গেছে, তার হিসেব নেই। এই সেঞ্চুরিতে এমন টোটাল ট্রান্সফার অফ পপুলেশন আর কোনও দেশে হয়েছে কিনা, তাদের জানা নেই।"[৬০]

সাতপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নয়, এক অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে সংঘ্যালঘু হিন্দুরা কোনোক্রমে প্রাণটুকু সম্বল করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোনোর জন্য সবকিছু ছেড়ে পথে বেরিয়েছে, কিন্তু সেই যাত্রাপথেও তাদের সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্নরকম বাধাবিপত্তির। হানাদারদের আক্রমণ, লুঠ, হত্যা, দাঙ্গা, নারীনির্যাতন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তাদের স্বভূমি পরিত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসতে হয়েছে। পথে মৃত্যু হয়েছে কত শত মানুষের, কেউ কিছু সঙ্গে নিয়ে এলেও সীমান্ত রহ্লীরা সে সমস্ত কেড়ে নিয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসেও হিন্দুদের দেশ ত্যাগ ও যাত্রাপথের কষ্টের বিস্তারিত কর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

বিনু ধর্ষিতা বিধ্বস্তা ঝিনুককে নিয়ে রাজদিয়া 'ত্যাগ করে কলকাতা যাবার সময় যখন তারপাশায় পৌঁছোয় তখন আরও অনেক হিন্দু নৌকোয় নদী পাড়ি দিয়ে স্টিমারঘাটে আসতে

লাগল। "সেগুলো থেকে যারা নামছে তাদের শঙ্কাতুর মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, দেশের ভিটেমাটি ফেলে চিরকালের মতো সীমান্তের ওপারে চলে যাবার জন্য ওরা স্টিমার ধরতে এসেছে। স্টিমার ঘাটটি সুরক্ষিত। উদ্বাস্তুদের পাহারা দেবার জন্য পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সেই স্টিমার ঘাটে "কাতারে কাতারে মানুষ আসছে, পুরুষদের মাথায় টিনের বাক্স, পাটি কি শতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, হাতে গাঁটরি বোঁচকা। সধবা বউদের এক কাঁকালে বাচ্চা, কাঁধে পোটলাপুঁটলি, যে বাচ্চাগুলো একটু বড় তারাও ছোটখাট কিছু না, কিছু হাতে ঝুলিয়ে আসছে।"[৬১] বিভিন্ন বয়সের এই যাত্রীদের চোখে মুখে 'অসীম ক্লান্তি আর আতঙ্কের ছাপ'। জেটিতে ঠাসা ভীড়। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। আবার স্টিমারের অনিশ্চয়তা রয়েছে। আবার অনিয়মিত স্টিমার এসে পৌঁছলেও তাতে উঠতে পারবে কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। স্টিমারের মতো ঠেলাঠেলি রেলগাড়িতেও। সেখানেও ঠাসাঠাসি ভীড়। কোনো মতে যদিও বা বর্ডারে পৌঁছনো গেল সেখানেও রয়েছে বর্ডার পুলিশের অত্যাচার। তল্লাসির নাম করে তারা জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি তো করছেই উপরন্তু নারী শরীরেও যথেচ্ছ হাত চালাতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। এভাবে তারা নিঃসম্বল মানুষগুলোর শেষ সহায়টুকুও কেড়ে নিচ্ছে। যাদের কাছে দামি কিছু নেই তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। আর কারো কাছে যদি সোনার গয়না, জমির দলিল টাকাপয়সা পেল অমনি সেগুলো কেড়ে নিচ্ছে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর শেষ সম্বলটুকু বাঁচানোর নিষ্ফল প্রচেষ্টায় বাতাসে শুধু বিলাপধ্বনি বয়ে চলেছে। দেশত্যাগের যন্ত্রণার এমন বিস্তৃত আর মর্মন্তুদ ছবি বাংলা উপন্যাসেও অল্পই আছে।

দীর্ঘপথের মানসিক উদ্বেগ ও বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছলেও সেখানে তাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। শিয়ালদা স্টেশনে লাখ লাখ মানুষের ভীড়, এবার তারা আশ্রয়ের সমস্যার সম্মুখীন হল। অথচ পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছনোর আগে তাদের মনে ধারণা ছিল এই সব দেশত্যাগী ছিন্নমূল মানুষগুলিকে ভারত সাদরে গ্রহণ করবে।

নেহেরুর বক্তৃতায় ছিল এমন আশ্বাসবাণী। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ভুবন দাসের অটুট বিশ্বাস ছিল "ইণ্ডিয়ায় সবাই তাদের জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে। সেখানে জমিজমা, ডোলা-ভরা ধান, বাড়িঘর, ফলবাগিচা, সমস্ত সাজানো রয়েছে। তারা ভারতে এলে তাদের হাতে সেসব তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার আগেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেল।"[৬২]

ভারতবর্ষে এসে সরকারি নথিপত্রে শরণার্থী হিসেবে তাদের নামগুলো পাকা জায়গা পেল। যাদের কলকাতায় কেউ নেই, তাদের কলকাতার আশেপাশে বা বিভিন্ন জেলায় রিলিফ ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে — সরকার এদের সব খরচ বহন করবে। আবার অনেকের ঠিকানা হয় শিয়ালদা স্টেশন, যেখানে "সাত আট ফুটের মতো জায়গা ইঁট পেতে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে এক একটা ফ্যামিলি। তার ভেতর গাদাগাদি করে আছে বাচ্চা-কাচ্চা, স্বামী-স্ত্রী এবং ডাঁই করা জিনিসপত্র। এইরকম অসংখ্য খোপ, অগুনতি পরিবার। .....শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই এখন তাদের ভরসা।"

বিভিন্ন সমীহ্লায় জানা যায় - ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ লহ্ল হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম বাংলায় এসেছিলেন - 'About 35 lakhs Hindu had come from East Pakistan to West Bengal from the time of the partition till January 1951.'[৬৩]

প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর The Marginal Man গ্রন্থে এই রিফুজীদের আসাকে তুষার ধস নামার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"This time the migrants come down like an avalanche."[৬৪]

যারা এদেশে এলেন অর্থাৎ উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছ থেকে অবাঞ্ছিত বোঝাস্বরূপ বিবেচিত হয়েছিলেন। এই মনোভাবকেও অস্বাভাবিক বলা যায় না। জনসংখ্যার

আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে খাদ্য ও বাসস্থানের টান পড়ল। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেল প্রবলভাবে। ফলে উদ্বাস্তুরা প্রায় অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনোরকমে টিকে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ: ভগ্ননীড়ের বেদনা' গ্রন্থে উদ্বাস্তুদের সেই সময়কার অবস্থার বর্ণনা পাই। গ্রন্থকার আর এন. সাক্সেনার বর্ণনা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। "The refugees were frightened, frustrated, dislocated and confused with no ideas of the future. They had lost all they had and been out off from their own family members without knowledge of what had become of them"[৬৫] রেলস্টেশনে, লাইনের ধারে, বনে বাদাড়ে যে কোনো ফাঁকা জায়গায় তারা কোনোরকমে একটু আশ্রয় নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্রয়ের সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, রোগব্যাধি ও অনিরাপত্তা প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট আকার ধারণ করল। ছিন্নমূল এই মানুষগুলির হারিয়ে গেল অতীত; ভবিষ্যতও হয়ে পড়ল অনিশ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের মানুষদের যে উচ্চ ধারণা ছিল তা 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসেও লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। "চল্লিশের কলকাতা আর এখনকার কলকাতা কি এক? প্রতিদিন ডাকে যে খবরের কাগজ আসে তাতে কলকাতার ভয়াবহ ছবি থাকে। সুবিশাল ওই মহানগর নাকি উদ্বাস্তুতে ছেয়ে গেছে। কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাই ছিন্নমূল নরনারীর দল রেল স্টেশনে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।"[৬৬] ঔপন্যাসিকের নয়, ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে তিনি বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।

দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে কলকাতায় এলে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চাকরি, নিরাপত্তা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কলকাতায় পৌঁছে সুরমার শাশুড়ির কাছ থেকে বিনু যে আঘাত পেল তাতে তার

কলকাতায় নিশ্চিত জীবনযাপনের আশা দুরাশায় পরিণত হল। অনেক প্রত্যাশা আর ব্যাকুলতা নিয়ে বিনু কলকাতায় এসেছিল। যুগলেরও সেরকম কলকাতায় এসে মন ভরে নি। সে যদিও কলকাতার উপকণ্ঠে পূর্ববঙ্গের মানুষদের নিয়ে একটা কলোনি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সীমান্তের এপারে এসে যুগলের হ্লোভের সীমা নেই। কলকাতা কেমন লাগছে এই প্রশ্নের উত্তরে সে বিনুকে বলে " ভালো না ছুটো বাবু। পদ্মা নাই, ম্যাঘনা নাই, ধলেশ্বরী নাই, কালাবদর নাই, আইড়ল খা নাই— এইটা এট্টা দ্যাশ হইল। রুখাশুখা মাটি। কইলকাতার কিনার দিয়া বড় একখান খাল চইলা গ্যাছে, হেইটার নাম গঙ্গা। এই নিকি নদী! শুইনা আমি আটাস (অবাক)। ইচ্ছা হয় এই পারের মানুষগুলারে ঘেটি ধইরা উইপারে লইয়া গিয়া দেখাই নদী কারে কয়। পদ্মা-ম্যাঘনা দেখলে সুমুন্দির পুতেরা ভিরমি খাইব।"[৬৯] সেই সুজলা সুফলা 'জল বাংলা'র স্মৃতি অবিরত তাদের মনে রক্ত ঝরায়। তবু তারা নতুন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে। যুগল মুকুন্দপুরে পূর্ববাংলার লোকেদের নিয়ে কলোনি গড়ে তুলেছে। এবং কলকাতায় এলে শিয়ালদায় গিয়ে পরিচিত মানুষদের খোঁজ করে। খোঁজ পেলে কলোনিতে নিয়ে আসে। কারণ 'চিনাজানা আত্মজন একলগে থাকলে মনের বল বাড়ে'।

ছিন্নমূল মানুষের এই নতুন শিকড় খোঁজার জন্য কলোনি গড়ার প্রয়াস প্রশংসনীয়। অনেকেরই স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এরকম যুগলের মতো বন জঙ্গল কেটে, জলাভূমি ভরাট করে, কুঁড়ে ঘর তৈরি করে নিত্যনতুন জনপদ তৈরি করে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বসবাস করতে লাগল। অভিজিৎ সেন এর 'হলুদ রঙের সূর্য' উপন্যাসে এরকম বর্ণনা জীবন্ত হয়ে আছে। 'কেয়াপাতার নৌকোয়' যুগলের সেরকম প্রয়াস দেখে হিরণ মুগ্ধ হয়েছে। "খুঁজে খুঁজে অমন একটা জায়গা বার করেছে। জঙ্গল কেটে কলোনি বসিয়েছে। সাপখোপ আর জমিদারের গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে ফাইট করে নিজেদের এসটাব্লিশ করতে চেষ্টা করছে।.....ইস্ট পাকিস্তান থেকে এসে যারা রিফিউজি

ক্যাম্পে আর রেল স্টেশনে ধুঁকে ধুঁকে মরছে তাদের যদি যুগলদের মতো সাহস, মনের জোর আর অ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিট থাকত!"[৬৮]

উদ্বাস্তুরা যারা কলোনিতে জায়গা করতে পারে নি, তারা শিয়ালদা স্টেশনে নিরুপায় হয়ে থাকছে, তাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। স্টেশনের বাইরে ও ভিতরে লোক গিজগিজ করছে। ইটের দশ বারো ইঞ্চি উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল তুলে পনেরো কুড়ি স্কোয়ার ফিটের মধ্যে এক-একটা উদ্বাস্তু ফ্যামিলি। ওই জায়গাটুকুর মধ্যে ছয় সাত জনের বাস। বউ-বাচ্চা- যুবতী মেয়ে নিয়ে এরই মধ্যে থাকতে হয় তাদের। অনেক সময় ধাক্কাধাক্কি মারামারি করে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পাওয়া যায় খিচুড়ি। হরিন্দ বিনুকে শিয়ালদা স্টেশনের অভিজ্ঞতার কথা জানায়— "এই জাগাটা এক্কেবারে নরক। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ, চাইরটা মোটে পাইখানা, গুমুতে চাইর দিক থিকথিকা। দুইবেলা দুই দলা কইরা খিচোড়ি খাইতে দ্যায়। ইস্টিশানে ছয় সাত হাত জাগার মইদ্যে আমাগো পাচজন মাইনসের শোওন-বসন.... হের উপুর শয়তানের গুষ্টি যুবতী মাইয়াগো ভাগাইয়া লইয়া যাইতে আছে। ট্যার পাই আমার মাইয়াটার উপুর শকুনের দিষ্টি আইসা পড়ছে।"[৬৯] হরিন্দ তাই বিনুকে অনুরোধ করে অন্য কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। সে খেতে পাক আর না পাক মেয়েদের সম্মান যেন রহ্লা করতে পারে। পতিতপাবনের মেয়ে নিয়েও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিয়ালদা স্টেশনে মেয়ে- পাচার চক্র একটা কাজ করে। যুবতী মেয়ে দেখলে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, তারপর তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। পতিতপাবন জানায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুবতী মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। পতিতপাবনের মেয়ে শান্তিকেও একটি লোক পকেট থেকে একগোছা নোট দিতে গেলে পতিতপাবন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রহার করে। সে বিনুকে জানায় —"এই মাইয়াটার সম্মান বাচানোর লেইগা পাকিস্তান ছাইড়া ইণ্ডিয়ায় আসলাম। কিন্তু এইহানেও শকুনের পাল অরে ছিড়া খাওনের লেইগা জিভ্যা

মেইলা রইছে।”[৭০] দেশভাগের সময় নারীদের সম্মানহানি দুই বাংলাতেই প্রবল আকার ধারণ করে। কলকাতায় উদ্বাস্তু মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে অনেক দুর্বৃত্ত নারী নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয়। তার সঙ্গে আবার নারী পাচার করেও একদল অসাধু ব্যবসায়ী অর্থ উপার্জনে নেমে পড়ে— যারা মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা করে। তাদের আড়কাঠিরা বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা নিয়ে এখানে অষ্টপ্রহর ঘোরঘুরি করছে। সুযোগ পেলেই একটা দুটো করে মেয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গেও হানাদাররা হরিদাস সাহার ঘর ভেঙে মাঝরাতে তার যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর শত খোঁজাখুঁজিতেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। এরকম অনেক পরিবারের মেয়েকে পূর্ববাংলায় হারিয়ে এদেশে এসেও কান্নায় ভেঙে পড়ে আত্মীয় স্বজন। কেউ কেউ আবার কাঁদে না. শোকে পাথর হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক ধর্ষিতা মহিলা এপারে এসেছে, যাদের যুগলরা আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে, ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে তাদের যন্ত্রণা। সকলে একসঙ্গে থেকে সমস্ত গ্লানি, যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু হেমনলিনী দেবী পারেন না ঝিনুককে কাছে টেনে নিতে। যে ঘটনার জন্য ঝিনুকের কোনো দোষ নেই, সেই অপরাধের বোঝা ঝিনুককে বহন করতে হয়েছে। তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরে ঝিনুকের স্থান নেই। তাই একবুক অভিমান নিয়ে ঝিনুক হারিয়ে গেছে।

দেশভাগের ফলে দেশত্যাগী সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তুরা এদেশে সঙ্গে করে এনেছে মধুর নস্টালজিয়া আর নারীর সম্মানহানির একবুক জ্বালা। তাই ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা যাত্রার সময় বিনুর মনে হয়েছে “ তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিমবাংলার মানুষ। মা পূর্ববাংলার মেয়ে। তার বুকের একধারে পূর্ববাংলা, আরেক ধারে পশ্চিমবাংলা। তার রক্তের এক স্রোত পদ্মা, আরেক স্রোত গঙ্গা। তার কোলের কাছে এই মেয়েটা — এই ঝিনুক? সে তো পূর্ববাংলার লাঞ্ছিত, অপমানিত আত্মা।”[৭১]

এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য ঃ "যুবক বিনুর এই স্বগতচিন্তায় সেই নতুন দিনের অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যার ইশারা পাই প্রবীণ হেমনাথ মিত্র আর মোতাহার হোসেনের সংকল্পে আর জীবনব্যাপী সাধনায়। আজকে ব্যর্থতাই শেষ কথা নয়। 'মনে রেখো সব মানুষই পশু হয়ে যায় নি; যেতে পারে না।' হেমনাথের উক্তিতে মানবতার প্রতি বিশ্বাস অটুট থেকেছে। একদিন ধর্ষিতা ঝিনুকের দুঃখের অবসান হবে। পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত অপমানিত আত্মা ফিরে পাবে তার সম্মান, মর্যাদা ঃ এই বিশ্বাসে উপন্যাসের সমাপ্তি অথচ কোথাও রাজনৈতিক বক্তব্য চেঁচিয়ে উঠে শিল্পকে খর্ব করে নি, প্রচার সাহিত্যকে ভ্রষ্ট করে নি। মধুর নস্ট্যালজিয়া এই উপন্যাসের শেষ কথা নয়, কঠোর বাস্তব— ইতিহাসের নিষ্ঠুর তথ্য এখানে স্বীকৃত। [৭২]

ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় নিজেও একজন বাস্তুত্যাগী ছিন্নমূল মানুষ। তাই এত গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করতে পেরেছেন পূর্ববাংলার এই দুঃখী মানুষদের দহনের আখ্যান। পূর্ববাংলার এই উদ্বাস্তু মানুষগুলো কেমন পরিস্থিতিতে ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছিল তার অজস্র বর্ণনা আমরা পাই। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে লিখেছেন "পূর্ববাংলার সরকার এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে হিন্দুরা ভারতে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দুদের নিষিদ্ধ মুসলিম খাদ্য খেতে বাধ্য করা হয়েছিল। ফলে আত্মসম্মান নিয়ে এবং নিজের ধর্মকে বাঁচিয়ে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।"

ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও দেশের প্রতি সমকালের প্রতি গ্রামজীবন ও সাধারণ মানুষের প্রতি লেখকের মমতা ও দরদ প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখকের শিল্পচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গভীর সমাজবোধ। ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আমাদের 'চেনাকালের ভাষ্য'।

৪

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪—) স্বাধীনতা পরবর্তী কালে অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, যিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত ট্রিলজি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান' লিখে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭১ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৭১ সনে। বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে উৎসর্গীকৃত উপন্যাসটি শুধু এক ব্যক্তি বা পরিবারের কাহিনি মাত্র নয় এবং এক জাতির হ্লয়ের ইতিহাসকেও উপস্থাপিত করেছে। দুইটি খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডে প্রাক্ দেশভাগ পর্বের অখণ্ড ভারতবর্ষ এবং তার সমস্যা অন্য খণ্ডে খণ্ডিত ভারতবর্ষের সূচনা এবং তার যন্ত্রণার হ্লত বিহ্লত চিত্র পরিস্ফুট।

পূর্ববাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিকায় রচিত একটি অনবদ্য উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। বাংলাদেশের নিসর্গ প্রকৃতির সুর যেমন এখানে বেজেছে ঠিক তেমনি ভাবে উপন্যাসটির মধ্যে দেশভাগের যন্ত্রণাও রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের গ্রাম্য জীবনের কথকতা। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দথেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মোট আঠারো বছরের বাংলার ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতির এক ভাঙাগড়ার প্রেহ্লাপটে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসটিতে দুটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। বাঙালি জাতীয় জীবনের সামজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র আমরা যেমন এখানে পাই, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবি ও অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে লেখক এই উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সর্বোপরি জন্মভূমির প্রতি যে নিবিড় টান ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে গোটা উপন্যাস জুড়ে, তা এক কথায় অনবদ্য। এক বিশাল প্রেহ্লাপটে দেশভাগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার শিকার সাধারণ মানুষের বিপর্যয়ের কাহিনি এখানে চিত্রিত। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত এই কাহিনি বিস্তৃত।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটির কেন্দ্রে আছে ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামের ঠাকুর বাড়ি, গ্রামের এক অতি সম্মানিত পরিবার। পরিবারের কর্তা মহেন্দ্রনাথ অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী শশীবালা, চার ছেলে মনীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথ। দুই পুত্রবধু বড়বৌ আর ধন বৌ, তিন নাতি— লালটু , পলটু, সোনা এবং এক নাতনি ছবি। মহেন্দ্রনাথ এই অঞ্চলের একজন সর্বজনমান্য মানুষ।

হেমন্তের বিকালবেলায়, অঘ্রানের শেষে উপন্যাসের সূচনা। হেমন্তের শেষবেলার রোদ্দুর সোনালি বালির নদীর চরের উপর পড়েছে। মাঠ-ঘাট আর নদীকে ঘিরেই পুববাংলার প্রকৃতির ছবি। আর ছবিগুলো যেমন দৃশ্যগ্রাহ্য তেমনি অনুভূতিগম্য। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক প্রকৃতিকে জলজ্যান্ত করে এঁকেছেন। "সোনালি বালির নদীর চরে রোদ হেলে পড়েছে। ঈশম শেখ ছইয়ের নিচে বসে তামাক টানছে। হেমন্তের বিকেল। নদীর পাড় ধরে কিছু গ্রামের মানুষ হাট করে ফিরছে। দূরে দূরে সব গ্রাম মাঠ দেখা যাচ্ছে। তরমুজের লতা এখন আকাশমুখো। তামাক টানতে টানতে ঈশম সব দেখছিল। কিছু ফড়িং উড়ছে বাতাসে। সোনালি ধানের গন্ধ মাঠময়। অঘ্রানের এই শেষ দিনগুলিতে জল নামছে খাল-বিল থেকে। জল নেমে নদীতে এসে পড়েছে। এই জল নামার শব্দ ওর কানে আসছে। সূর্য নেমে গেছে মাঠের ওপারে। বটের ছায়া বালির চর ঢেকে দিয়েছে.....।"[৭৪]

পূর্ববাংলার ছবি লেখক কবির অনুভূতি দিয়ে এঁকেছেন। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ ও পবিত্র মুহূর্তে অঘ্রানের শেষ বেলাতে ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তা চন্দ্রনাথের ছেলে সোনাবাবুর জন্ম। আর এই সংবাদ ধনকর্তাকে পৌঁছে দিতে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই মাথায় পাগড়ি বেঁধে একটা লাঠি আর একটা লণ্ঠন হাতে মাঠে নেমে পড়েছে ঈশম। এদিকে চারদিন আগে ধনবৌর চিঠি পেয়ে বাড়ি ফিরছেন চন্দ্রনাথ; তাঁর সঙ্গে সুন্দর আলি। চন্দনের বড় নৌকার মাঝি আবেদালি নারায়ণগঞ্জে সওদা করে বাড়ি ফেরার পথে ঠাকুরবাড়ির বড়কর্তা পাগল ঠাকুরকে দেখেছে,

গোরস্থানে বসে থাকতে। একবার সে ভেবেছে 'কর্তারে ধইরা নিয়া গ্যালে হয়। কিন্তু বুড়ো ঠাকুরণ শশীবালার কথা মনে করে কেমন সংকুচিত হয়ে গেল। যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, যদি বলেন, তুই ক্যান অরে ধইরা আনলি। আবার অরে সান করান লাগব, এই সব ভেবে উঠোনে আর দাঁড়ল না।'[৭৫]

লেখক এখানে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরার পশ্চাতে কারণগুলি বাস্তবসম্মত রূপে তুলে ধরেছেন। নিম্নবর্গের মুসলিমরা অভিজাত হিন্দুদের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিত, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় জাতিগত ঘৃণা মুসলমানদের বার বার আঘাত করেছে। তবুও তারা হিন্দুদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখত। পাগল ঠাকুর আর তার তাদের বাড়ির সকলের কষ্ট যেন আবেদালির নিজের। তাই সে থাকতে না পেরে সন্তান জব্বারকে বড় কর্তার খবরটা তাদের বাড়িতে দিয়ে আসতে বলে। কিন্তু জব্বার সেই কাজ করতে রাজি নয়। কারণ একটাই তাদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা। সে বলে "হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু।"[৭৫]

নতুন প্রজন্মের এই মানসিকতার দরুণ হিন্দু মুসলমানের এতদিনের পাশাপাশি সহাবস্থানে অদৃশ্য ফাটল দেখা দিয়েছে। "আবদালি মাথা নিচু করে খেতে বসে গেল। ঝালে-কি ছেলের কথায় চোখ ছলছল করছে বোঝা যাচ্ছে না।"[৭৭] অবশ্য শেষ পর্যন্ত আবেদালি ঘর থেকে বেরিয়েই পড়েছে। জব্বারদের প্রতিবাদ আর ঢাকার রায়টে হিন্দু মুসলমানের খুনোখুনিতে দুই সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ কচুকাটা হচ্ছে। আবেদালিকে এই খবর বিচলিত করে, তাই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্লার উদ্দেশ্যে বলে— "আল্লা দ্যাশে এটা কী শুরু হইল?"[৭৮] এই দীর্ঘশ্বাসই সমস্ত পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষদের; বলা ভালো সময়ের।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সহজ প্রীতি আর ভালোবাসার ছবি পাশাপাশি বয়ে চলেছে-- আর তার মধ্যেই একটা ঢেউ, একটা প্লাবন সব কিছু তছনছ করে দিতে এগিয়ে আসছে।

লিগের নেতা সামু ওরফে সামমুদ্দিন পর্যন্ত সুখে-দুঃখে হিন্দুদের পাশে থাকে। তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে ভোলে না। তেমনি হিন্দুরাও। সামু শচীন্দ্রনাথ ও ঈশমের সঙ্গে বড়কর্তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে,মনজুরও তেমনি ঘরে বসে থাকতে পারে না,তাদের সঙ্গ নেয়। শচীন্দ্রনাথের কাছে 'ধনকর্তার পোলা' হওয়ার সংবাদে মিষ্টি খেতে চেয়েছে। আবার শচীন্দ্রনাথ কুশল বিনিময় করলে 'সে ভালো নেই' বলে জানায়।

এই সম্পর্ক প্রতিবেশীর সঙ্গে আরেক প্রতিবেশীর আত্মীয়তার স্বাভাবিক চিত্র। শচীন্দ্রনাথদের দুঃখে সামসুদ্দিন ও দুঃখী, আবেদালির মতোই তার হৃদয় আর্ত হয়। তাই ছোটকর্তার সঙ্গে পাগল ঠাকুরকে সেও খুঁজতে বেরিয়েছে। 'যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এই সব মানুষের ভিতরে।' যে শশীবালা ছোঁয়াছুঁয়িতে বিশ্বাসী, তিনি সামুর মায়ের কোমরের ব্যথার খবর নিতে ভোলেন না। আবার 'মার কমরে ব্যাদনা হইছে' শুনে 'তিনি ঘরে ঢুকে একটা পুরোনো শিশি বেব করে আনলেন বললেন, শিশিডা নিয়া যা সামু। কমরে ত্যাল মালিশ করতে কবি।"[৭৯] এই স্নেহ আর ভালোবাসার গ্রন্থিতে আবদ্ধ দুই সমাজকে পাশাপাশি দেখলে কেউ ভাঙনের স্বপ্ন দেখতে পারবে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে তা শ্রীশচন্দ্রের উদ্বেগ আর দীর্ঘশ্বাসে পরিস্ফুট— "হাটের সুখ এখন নাই ল মা, পরাপরদীর বাজারে সব মুসলমানরা এখকাট্টা। অরা ঠিক করছে হিন্দুর দোকান থাইকা আর কিছু কিনব না।"[৮০]

মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ—এই স্বপ্ন দেখে টোডারবাগের সামসুদ্দিন ওরফে সামু। নিজেদের সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই, আর সেই কারণে মুসলিম লিগের হয়ে মুসলমান সমাজকে সচেতন করার জন্য 'জাল্‌সা' বা জনসভা করে এবং গাছে গাছে পোস্টার ঝোলায়। এই নিয়ে বাল্যসঙ্গিনী মালতীর সঙ্গে তার বচসা বেঁধেছে। অথচ কোনদিন মালতীর সঙ্গে বিবাদ করে নি সামু। সে মালতীকে বলে "আমার জাতভাইরা বড় বেশি গরু-

ঘোড়া হইয়া আছে। একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ, চাকরি তগ,জমি তগ, জমিদারি তগ। শিহ্লা দীহ্লা সব হিন্দুদের"।[৮১] এই বাস্তবে ব্যথিত হলেও সামু হয়তো কোনদিনই দেশের ভাঙন চায় নি। তাই মালতীকে সে বলে 'দেশডা তোর আমার সকলের'। কিন্তু মানুষের অসম্মান আর পরাধীনতা যেন তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলছে— তাই দেখি, নিজের জাতভাই-এর জন্য মুসলিম দেশ তৈরির স্বপ্ন তাকে সক্রিয় করে তোলে। সামুর দ্বারা অনুপ্রাণিত টোডারবাগের মানুষেরা গ্রামের গাছে গাছে , মাঠে মাঠে ইস্তাহার ঝোলাতে থাকে। তাদের এখন এক মন্ত্র— 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' লেখা ছিল, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আর লেখা ছিল 'নারায়ে তকদির।' বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই এই ছিল পূর্ববাংলার সর্বত্র এক উন্মাদনার ছবি। অতীনের বর্ণনা ইতিহাসকেই উন্মেচিত করে।

গাছে গাছে এই ইস্তাহার আর স্বাধীন পাকিস্তানের মন্ত্রকে দেখে মালতী আঁতকে ওঠে। ঢাকা শহরের দাঙ্গায় তার স্বামী মারা গেছে। শাঁখারী, কুট্টিরা ও বদলা নিচ্ছে। আবার মুসলিম লিগের ইস্তাহার জনসভা, মিটিং মালতীর মনে কিসের বিপদের আশঙ্কা হয়। সে চিৎকার করে বলতে চাইল, সামুরে তুই দেশটার কপালে দুঃখ ডেকে আনিস না।

অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির ছোটকর্তা শচীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ভোটে জয়লাভ করে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। সামুসুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লিগের জনসভা আর অপর দিকে শচীন্দ্রনাথ — এই দুই শক্তির মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করে চলেছে। মুড়াপাড়া থেকে ভূপেন্দ্রনাথ এসে জানিয়েছেন রায়ট লাগার সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির বৈঠকখানায় অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনায় ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন চালাচ্ছেন গান্ধীজী। ইংরেজ লাঠি, গুলি চালাচ্ছে। এদিকে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী লিগের পহ্ল নিচ্ছেন। অতএব লিগের পোয়াবারো। একই সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন "চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, আনন্দময়ী কালীবাড়ির পাশে বন জঙ্গলের

ভিতর পুরানো একটা বাড়ি আছে, একটা দিঘি আছে। কেউ খবর রাখে না। এখন তর চরের মৌলভি– সাব কয় ওটা নাকি মসজিদ। মুসলমানরা কয় নামাজ পড়ব,.... জায়গাটা অমর্ত্যবাবুর! পাশে আনন্দময়ী কালীবাড়ি। আগুন জ্বলতে কতহ্লণ।"[৮২]

গ্রামে শ্যাওড়া গাছের পাশে বড় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। শতরঞ্চি পাতা হচ্ছে। মিএহ্লা ও মৌলবিরা এসে জড়ো হচ্ছেন। এই গ্রামের সর্বত্র ও অন্যান্য গ্রামেও যত্রতত্র ইস্তেহার টাঙানো হয়েছে। কিন্তু পাগল ঠাকুর মুড়াপাড়ার হাতি নিয়ে গিয়ে সব তছনছ করে দেন। যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালায়। হাতি ফেলুকে শুঁড়ে ধরে ঘুরিয়ে আবার ছেড়ে দেয়। তাতেই ফেলুর একটা হাত ভেঙে যায়, হাতটা ক্রমে শুকিয়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। তবুও মুসলমানদের তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ গড়ে ওঠে নি। সবাই পাগল ঠাকুরের মধ্যে দরগার পীরবাবাকে প্রত্যহ্ল করে। কিন্তু সামসুদ্দিনের মধ্যে একটা প্রতিহিংসা জ্বলে ওঠে। অথচ সে জানে পাগল ঠাকুরের মধ্যে কোন প্ররোচনা ছিল না, তবু তার মনে হয়েছে ছোটকর্তা যেদিন কংগ্রেসের হয়ে সভা করবে গ্রামে সেদিন— "সে ভাবছিল, এমন একটা হাতি পাওয়া যাবে না সেদিন! হাতির পিঠে ফেলু বসে থাকবে। অথবা ফেলুকে দিয়ে মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দিলে যেন সব আক্রোশের শোধ নেওয়া যাবে।"[৮৩] অবশ্য এই প্রতিশোধ সামু নিতে পারে না। বাল্যবন্ধু রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ছোটকর্তার ব্যবহারে আত্মীয়তার আভাস ফুটে ওঠে। ছোটকর্তা সামুর মাকে 'পিসি' সম্বোধন করে বলে "পিসিরে অচিকিৎসায় মারবা সে হইতে দিমুনা।" গ্রামবাংলার এই যে সম্প্রীতির বন্ধন— একে ভেঙে দেওয়া খুব সহজ ছিল না। কিন্তু লিগ আর কংগ্রেস দুই তরফেই প্ররোচনা যে ছিল — আজকের পাঠকের তা অজানা নয়।

ফেলু শেখের চোখে প্রতিশোধের আগুন ক্রমে বাড়তে থাকে। যে ফেলুর ভয়ে পাশাপাশি দশটা গ্রাম চুপ করে থাকত, সেই ফেলু লিগের জনসভায় নিজের বাম হাতটা হারিয়েছে

পাগল ঠাকুরের হাতির অত্যাচারে। শুটকি মাছ রোদ শুকোতে দিয়ে কাক তাড়াতেও আজ ব্যর্থ ফেলু প্রতিহিংসার আগুনে ফুঁসছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের ভাঙনের জন্য কারণ হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরেছেন লেখক। সামাজিক কারণ হিসেবে হিন্দুদের ছোঁয়াছুয়িঁর বাছবিচারকে তুলে ধরেছেন। আর ফেলুর ভাবনায় হিন্দু মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রকৃত চেহারা ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। "গ্রামের পর গ্রাম অথবা বিস্তীর্ণ মাঠ, মুসলমান গ্রামগুলিতে হাহাকার যেন বেশি। কোন কোন গ্রামে হাজিসাহেবের মতো ধনী আছেন, তাদের সুখ অন্য ধরনের। ..... আর হিন্দু গ্রামগুলির দিকে তাকাও— পুবের বাড়ির নরেন দাস — তার জমি আছে, তাঁতের ব্যবসা আছে। দীনবন্ধুর দুই তাঁত দুই বউ। সুখে আছে লোকটা। আর ঠাকুর বাড়ির মানুষেরা শোনা যায় তল্লাটের বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ.... মেজ ঠাকুর, সেজ ঠাকুর দু'দশ ক্রোশ হেঁটে গেলে মুঢ়াপাড়ার জমিদারদের কাছারিবাড়ির নায়েব গোমস্তা, জমিদারদের বড় বিশ্বাসভাজন লোক। ওদের স্বচ্ছল সংসার। তারপর পাল বাড়ি— জমি আছে ওদের। মিলের কাজ আছে। তারপর মাঝিরা — ওদের বড় বড় গরু।"[৮৪] আর মুসলমানদের অবস্থার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন এইভাবে — "গতকাল আবেদালির কোনও কাজ ছিল না, আজ সারাদিন হিন্দু পাড়া ঘুরে ঘুরে একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারেনি। এখন চৈত্র মাস, সবকিছুতে টান পড়েছে ..... আবেদালি সারাটা দিন কাজ করেছে — যেহেতু কাম্‌লার সংখ্যা প্রচুর এবং মুসলমান পাড়াতে রুজিরোজগার বন্ধ, যার গরু আছে সে দুধ বেচে একবেলা ভাত-অন্যবেলা মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাচ্ছে, আবেদালির গরু নেই, জমি নেই, শুধু গতর আছে। পূর্ববঙ্গের ভূমি মালিকানার দিক থেকে দেখলে এটা বাস্তব ছিল যে, জমিদার জোতদার ছিলেন হিন্দু মূলত বর্ণহিন্দুরা প্রান্তিক শূদ্র এবং মুসলমানেরা ছিলেন রায়ত ও ভূমিহীন।

ফেলুর দৃষ্টিতে হিন্দুদের এই স্বচ্ছল অবস্থা কাটার মতো বিঁধে। একদিকে হিন্দুদের এই সব সমৃদ্ধিশালী বাড়িগুলোতে যখন বাস্তুপুজোর উৎসব, একসাথে অনেকগুলো ঢাকের আওয়াজ কিংবা মোষবলি চলে, তখন মুসলমান জনজীবনে দেখি বিপরীত ছবি। আবেদালির দিদি জোটন – দুদিন থেকে তার পেটে ভাত নেই, শালুক সিদ্ধ করে খাচ্ছে সে। গরিব মুসলমান নরনারী পেটের খিদে মেটানোর জন্য ফাওসার বিলে শালুক তুলতে যায়। এখন ফাঁকা মাঠ। শীতকাল থাকলে তবু দু-এক ছড়া ধান শামুকের মুখে কেটে কোঁচড়ে ভরতে পারতো। কিন্তু এখন তার উপায় নেই। আর এই শালুক তুলতে গিয়ে ফাওসার বিলে জালালির মৃত্যু দৃশ্য জনমানসে কিংবদন্তি গড়ে তোলে।

ফেলুর চোখে দুদিকের দুই ছবি ফুটে উঠেছে। সে বাছুর নিয়ে গোপাটে নেমে গেল। খোটা পুঁতে দিলে দেখল কাতারে কাতারে লোক বিলে শালুক তুলতে যাচ্ছে। সব মুসলমান বিবি, বেওয়া, ওরা এ অঞ্চলের সব মুসলমান গ্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। আর এই তো সামনে বিশাল বিলেন মাঠ। হাইজাদির সরকাররা পুকুরপাড়ে বাস্তুপূজা করছে। ভেড়াবলি হচ্ছে, ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে।

এই বৈষম্যের ছবি দেখতে দেখতে ফেলুর মনে হিন্দুদের সমৃদ্ধি মনঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে সামুর লিগের কথা। সামুর বলা কথারই যেন প্রতিধ্বনি করে সে, "আমাদের জন্য একটা দেশ চাই। এই দেশে আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা জায়গা চাই। তারপর যে কথা শুনলে ফেলুর ঘুম চলে আসে— একদিন এ-দেশটা দুঃখী মানুষের হয়ে যাবে। ফেলু দুঃখী মানুষ ভাবতে সে প্রায় তার গোটা স্বজাতিকে ভেবে ফেলেছিল।..... সামু বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। আমাদের জন্য দেশ, এই দেশ মাটি ফসল সব আমাদের জন্য হবে। আমাদের সুখের জন্য হবে। অধিকাংশ মানুষ যখন আমরাই এই দেশে বসবাস করছি, তখন এই দেশ আমাদের।"[৮৫]

অন্যদিকে গান্ধী টুপি পরে কংগ্রেসি নেতা অখণ্ড ভারত গড়ার জন্য জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন-আমরা এক অখণ্ড দেশ চাই। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এক দেশ, এক জাতি, হিন্দু-মুসলমানের এক পরিচয়, আমরা ভারতবাসী। বক্তৃতা শুনে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে মনে মনে হেসেছিল আকালুদ্দিন। তারপরই পরাপরদির গ্রামে মাদ্রাসার মাঠে সামসুদ্দিন বক্তৃতা করে— হিন্দু মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারে না।.... হক সাহেবের দল কোন সাম্প্রদায়িক দল নয়, সাধারণ মেহনতী মানুষ নিয়ে এই দল। কৃষক প্রজা নিয়ে আন্দোলন। অথচ হিন্দুদের এমন মুসলিম বিদ্বেষ যে, তাঁরা কিছুতেই যৌথ সরকার গঠন করলেন না। ফজলুক হক ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধকে হিন্দু বিরোধী প্রচাবের হাতিয়ার করেছে লিগ। এর সঙ্গে আছে কুৎসা মিথ্যা প্রচার। তারপর মুসলমান নিধনের মিথ্যা রিপোর্ট প্রচার করতে গিয়ে মালতীর করুণ মুখ মনে পড়ে যায় সামুর। বিবেকের দংশনে তার গলা শুকিয়ে গেল। তারপর কোন রকমে সে ঘোষণা করে "মুসলমানদের ভিন্ন দেশ বাদে গতি নাই।"[৮৬]

ক্রমশ এই সাম্প্রদায়িক প্রচার আরো উগ্র হয়।শুধু সভা-সমিতি বা বক্তৃতা নয়, তারা প্রকাশ্যে হিন্দুদের নিধন চাইছে— 'পুব দেশে যত কাফের আছে, কাফের নিধন করে পতাকা ওড়াও।"[৮৭] পূর্ববাংলার যেখানে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি আত্মীয়ের মতো বসবাস করেছে সেখানে হন্তারক সময়ে তাদের ব্যবধান এবং মত-পার্থক্য কোথায় পৌঁছেছে এখানে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। হিন্দুদের জাতপাত,ছোঁয়াছুঁয়ি, বাছবিচার মজ্জাগত হলেও তারা মুসলমানদের হেয় করে না। ফতিমা সোনাবাবুর জন্য ফল নিয়ে এলে তা গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে সোনাকে দেওয়া হয় ঠিকই, আবার ফতিমাকে আদর করে ওদের পরিবারের সকলের জন্য মিষ্টিও হাঁড়িতে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবেদালির স্ত্রী জালালি শালুক তুলতে গিয়ে বিলের জলে ডুবে মারা গেলে, রাতে নৌকা নিয়ে গিয়ে সামসুদ্দিনরা সেই লাশ খুঁজে পায় নি।

পাগল ঠাকুর ঠাণ্ডা জলে সাঁতার দিয়ে গিয়ে দুই পদ্ম পাতার মাঝে ডুব দিয়ে তুলে এনেছে লাশ। জালালির লাশ বাঁশে বেঁধে গ্রামে নিয়ে আসার সময় রঞ্জিতের মনে একটা খারাপ লাগা তৈরি হয়েছে। একদিকে উৎসব অন্যদিকে জীবনসংগ্রামের জন্য জলে ডুবে মৃত্যু। বোধহয় রঞ্জিতকে মানুষে-মানুষে এই প্রকট আর্থিক বৈষম্য পীড়িত করেছিল। সে ছিল স্বদেশি। দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণপন করেছিল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সকল দেশবাসীর জন্য স্বাধীনতার অর্থ সে খুঁজে পেয়েছিল। "অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হল, এই একখণ্ড জমি সকলের প্রাপ্য। সবাইকে এই দিতে হবে অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নীচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতা অর্থ হয় না। মানুষের স্বাধীনতা বলতে সে এই বোঝে, তার কেন জানি এবার মনে হল সে একখণ্ড জমি মালতীকেও দেবে।"[৮৮] অর্থাৎ তার স্বপ্নের স্বাধীনতা এলে কেউ অভুক্ত থাকবে না। মালতীদের মতো নির্যাতিতা বিধবারাও নিজ অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু কিছু মানুষ নিজের ন্যস্ত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষগুলোকে ধর্মের নামে হ্লেপিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেশছাড়া করতে উঠে পড়ে লেগেছিল।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ফাটল বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা সামনা-সামনি প্রত্যহ্ল হল। মুসলিমরা রাতের অন্ধকারে গ্রামের পর গ্রাম মশাল দিয়ে জ্বালাতে থাকে। টোডারবাগের মানুষজন বড় আতঙ্কে দিন কাটায়। একদিক থেকে আসে 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনি অন্যদিক থেকে 'বন্দেমাতরম'— দুই জাতি যেন মুখামুখি হচ্ছে, কোনো এক ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে। তরমুজ খেতে ঈশম এই দুই সম্প্রদায়ের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে হাহা করে হাসে আর বলে — "কার দ্যাশ, কে বা দিবে, কে বা নিবে।" ঈশমের বোধের মধ্যে আছে মানবিক সত্তা, যে অন্ততপহ্লে জানে অহেতুক একটি সর্বনাশ টোডারবাগের আকাশে বাতাসে ঘনিয়ে আসছে।

রাত হলেই হিন্দু বাড়ির মানুষেরা ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে কিংবা বাসনপত্র ও গয়নাগাটি লুঠপাটের ভয়ে কুয়োতে এবং ছাইগাদার নিচে রেখে দেয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে লেখক হাজি সাহেবকে একচক্ষু ষাঁড়টির সঙ্গে তুলনা করেছেন। আসলে ধর্মের মোহে একটি অন্ধকার মহূর্তকে মানুষ ডেকে আনছে। আলিসাহেব, আকালুদ্দিনরা জানে কীভাবে পরিস্থিতি থেকে নিজেদের আখের গোছাতে হবে, তাই তারা চেয়েছে— "এই দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ জাগিয়ে দাও। অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা এখন বলা যাবে না। শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলা যেত, কিন্তু কিছু উপর তলার মানুষ রয়ে গেছি আমরা, আমাদের তবে কী হবে। তার চেয়ে ভালো ধর্ম জাগরণ। ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আখের গুছিয়ে নাও।"[৮৯]

ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ তাই দেশের সর্বত্র জুড়ে চলেছে। ইংরেজেরা দেশ ছাড়ার পূর্বে আলিসাহেব, আকালুদ্দিনদের মতো নেতাদের মনে হ্ল মতার স্বপ্ন প্রোথিত করল। ১৯৩৫ সালে এই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন চক্র গড়ে তারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। আর সেই কৌশলকে বুঝতে পারল না হাজার হাজার অজ্ঞ, অশিহ্লিত জনসাধারণ। একটি অন্ধমোহে দুই দলের মধ্যে ধর্মজাত বিদ্বেষে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান আর ভারতবর্ষের মাটি।

উপন্যাসে তাই দেখি মুড়াপাড়ার শীতলহ্ল্যা নদীর চরে হাজার হাজার মুসলিম জমায়েত হয়েছে ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়বে বলে। কিন্তু হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে জেনে এসেছে ওটি কালী মন্দির — অতএব সংঘর্ষ অনিবার্য। আর এই অহেতুক সংঘর্ষে প্রাণপাত ঘটবে হাজার হাজার সাধারণ হিন্দু মুসলমানের। হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন এরকম একটি ধর্মযুদ্ধ ঘটতে চলেছে, তখন লেখকের সচেতন বিশে-ষণটি প্রাণিধানযোগ্যঃ "কীযে ছিল এটা! গম্বুজ দেখে মুসলমানেরা ভেবেছে এটা মসজিদ, খিলান দেখে বাবুরা ভেবেছে এটা মন্দির এবং ঐতিহাসিকদের মতে আখড়া, কারণ তার মিনারে নানারকম হলুদ নীল

কাচের সন্ধান পেয়েছিল, স্থাপত্য শিল্পে পর্তুগীজদের কাছাকাছি— সুতরাং জলদস্যুদের আখড়া না হয়ে যায় না। এই হাস্যকর অবস্থায় মানুষেরা এখানে এসে ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষ, না কোরবানির জন্য মানুষ বোঝা যাচ্ছে না। কারণ ভাবলে বিশ্বাসই করা যায় না এই এক হাস্যকর ব্যাপারে এ দেশে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।"[৯০]

সত্যি করেই লেখকের উক্ত বক্তব্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে জীবনের চরমতম উপলব্ধি। প্রশ্ন উঠেছে মানুষের জন্য মানুষ, নাকি কোরবানির জন্য মানুষ? এইবোধ যেমন মুসলমানদের মধ্যে থেকেও ছিল না, কারণ ওপরতলার নেতৃত্ব অজ্ঞ জনসাধারণকে তা বুঝতে দেয় নি। আবার হিন্দুদের শুচি-অশুচি, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভাবনার প্রত্যহ্ল বিনষ্টি সমকালকে বিষিয়ে তুলেছিল। ধর্মের অন্ধ মোহে স্বাধীন দেশের, নিজেদের একটি দেশের স্বপ্ন ফেলুর চোখেমুখে। তাই সে নিজের হাতে পালন করা বাগি গরুটাকে কোরবানি দিতে নিয়ে এসেছে শীতলহ্ল্যার তীরে। সামসুদ্দিনের জ্বালময়ী হিন্দু-বিদ্বেষী বক্তব্যে, সুরাবর্দি সাহেবের নেতৃত্বে ফেলুর মতো হাজার হাজার মুসলমানের ভিতর বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। সরাসরি সংঘর্ষ বেধেছে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য বিশটা রাইফেলের ট্রিগারের শব্দ শীতলহ্ল্যার পাড়কে প্রকম্পিত করেছে। রাইফেলের গুলিতে মানুষের তাজা রক্ত মাটিকে রাঙিয়েছে।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে ডাইরেক্ট অ্যাকশন এর আহ্বান পূর্ববঙ্গে চূড়ান্ত একতরফা আক্রমণে রূপান্তরিত হয়। উপন্যাসে দাঙ্গার সরাসরি কোনো চিত্র নেই, আছে ভয়াল সংবাদপ্রবাহ ঃ "যখন মুসলমান গ্রামগুলিতে ক্রমে ক্রমে ধ্বনি উঠতে থাকে— নদীর পাড়ে পাড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সেই ধ্বনি বড় ভয়াবহ, বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সবাই কেমন ঘোলা ঘোলা চোখ মুখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। দূর দেশের নানারকম দাঙ্গার খবর আসে। নৃশংস সব ঘটনা ঘটছে কোথাও। কিভাবে যে এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। কেবল সামসুদ্দিন জানে— ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। সুরাবর্দি সাহেব

পরের হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে। নদীর জলে মরা গরু বাছুর ভেসে যায়। গরু-বাছুর না মানুষ কেউ ইচ্ছা করে আর দেখতে যায় না।"[৯১]

দাঙ্গার আতঙ্ক যে কত হৃদয়বিদারী হতে পারে তার বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। 'কখনও কখনও ওরা সারা রাত ঘুম যায় না। গ্রাম পাহারা দেয়। আবার কোনও রাতে ওরা অন্ধকারে দরজা খুলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। আলো জ্বালে না কেউ। ভয়ে গুটি গুটি বের হয়ে ডাকে, আপনারা কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছেন না! একটা গুম গুম আওয়াজ উঠছে! মনে হয় না হাজার হাজার মানুষ অন্ধকারে চুপিচুপি আপনাদের পুড়িয়ে মারার জন্য ছুটে আসছে! সবাই আর ঘুম যেতে পারে না তখন। জেগে বসে থাকে — কখন আক্রমণ ঘটবে এই আশঙ্কায়।"[৯২]

সোনার বড় জ্যাঠামশায় একদিন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আর তিনি ফিরে আসেন নি। ফেলু তাকে হাসান পীরের দরগায় হত্যা করে লাশটা গুম করে দিয়েছে। সোনার জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর সোনা ও ফতিমা জ্যাঠামশায়কে খুঁজতে বেরিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে শ্রান্ত, ক্লান্ত সোনা ও ফতিমা দেখতে পায় একটা লোক অদ্ভুত রঙের নিশান মাথায় নিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে— "বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে।..... আমরা বাংলাদেশের মানুষ এবার আলাদা হয়ে যাব।" সোনা লোকটার কথা ঠিক বুঝতে না পারলেও ফতিমা এসব খবর বেশি রাখে। তাই তার বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই সে "অসহায় চোখে সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল।"

সোনা বাড়ি ফিরে শুনেছে শশীভূষণ কাগজ পড়ে শোনাচ্ছেন। ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া থেকে কাগজ নিয়ে এসেছেন মাউন্টব্যাটেনের বেতার বক্তৃতা, মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব — সবই উপন্যাসে পরিস্ফুট। "শেষ পর্যন্ত পার্টিশানই ঠিক হল?.... তাহলে কপালে পার্টিশান ছিল আমাদের।" শশীভূষণ,শচীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথদের অখণ্ড ভারতের

স্বাধীনতা স্বপ্ন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে জীবনকে তছ নছ করে দিয়েছে। ঈশম এত কিছু বোঝে না। সে শুধু এটুকু বেঝে— "দেশ ভাগ হলে, এ দেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে। বাংলা দেশের নাম পাকিস্তান— ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। আর একটা অংশ হিন্দুস্থানে চলে যাবে।.... এত বড় বাংলাদেশের নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। এটা সামু করেছে। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে যেন সে বলত, কী লাভ তর, দেশটারে ভাগ করে, দুই দেশের কাছে ইজারা দিলি।"[৯৩]

দেশভাগ পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য নিয়ে এল চূড়ান্ত বিপন্নতা। তারা দেশভাগের আনন্দে সামিল হতে পারল না। কিন্তু চারপাশে সব বড় বড় নৌকায় লাল নীল রঙের পতাকা, কত রঙ বেরঙের চাঁদমালা, কাগজের ফুল, নতুন লুঙ্গি পরে, নতুন জামা গায়ে মাথায় ফেজ টুপি পরে ছেলেরা, মেয়েরা নাকে নোলক পরে, নদীর চরে নৌকা ভাসিয়ে সারি সারি চলে গেল।

দেশভাগ হয়ে যাবার কিছুদিন পর ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়া থেকে বাড়ি ফিরে, শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে হিন্দুস্থান চলে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন। কারণ এদেশে থাকলে আর মানসম্ভ্রম নিয়ে বাঁচা যাবে না। "তবু এই দেশ এবং মাটির জন্য সবার মতো ভিতরে একটা ভীষণ হাহাকার আছে। ছেড়ে যেতে যে কী কষ্ট!" এই ছেড়ে যাওয়ার বেদনা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটির প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকশিত হয়েছে। হৃদয়ে যে অবিরাম রক্তহ্লরণ হয়ে চলেছে তা লুকাতেই যেন তিনি সান্ত্বনা খুঁজে নিচ্ছেন। "গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি। তোমরা অন্তত এই শরীরটা গঙ্গার পারে দাহ করতে পারবা।" হৃদয় নিংড়ে যে যন্ত্রণাবোধ হয়েছে তাই যেন উজাড় করে দিয়েছেন লেখক। এত রক্তহ্লয়, এত আন্দোলন স্বাধীনতার জন্য। সেই কাঙ্খিত স্বাধীনতা কি সত্যিকারের আনন্দ বয়ে আনতে পেরেছিল এই ভিটেমাটি হারা, স্বজনহারা মানুষগুলোর জন্য? উপন্যাসে দেখি প্রতাপচন্দ্রের দুই ছেলের 'দেশ ছেড়ে

কি ভালো হবে' এমন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে দীনবন্ধু—"থাকতে গেলে হিন্দু হইয়া থাকন যাইব না। মুসলমান হইতে হইব। যদি তা পার থাক।"[৯৪]

গ্রামে বার্তা রটে যায় জলের দরে জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন ভূপেন্দ্রনাথ। দাম কম হলেও শচীন্দ্রনাথ এ বাড়ি কখনও মুসলমানদের কাছে বিক্রি করতে পারবেন না। "যেন বিক্রি করলেই যেখানে ঠাকুরঘর সেখানে মসজিদ উঠবে, যেখানে মাঘ-মণ্ডলের ব্রতকথা বলত ছোট ছোট বালিকারা সেখানে কোরবানি হবে— এই সব ভাবতেই তার চোখ মুখে এক তীব্র আক্রোশ ফুটে উঠল।"[৯৫] বাড়ির এক একটা টিন যখন খুলছে তখনই মনে হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের, এক একটা পাঁজর কেউ বুক থেকে তুলে নিচ্ছে। আর সোনা অর্জুন গাছে বড় বড় অহ্লরে তার জ্যাঠামশায় যদি ফিরে আসেন এই আশায় লিখে রাখছে "জ্যাঠামশায়, আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি— ইতি সোনা"। ওদের চলে যাবার সময় যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় নদীর পাড় ধরে ঈশম ততদূর হেটেঁছে। সারাদিন তার খাওয়া হয় নি। রুগ্ন বিবিরও খাওয়া হয় নি সারাদিন। জীবনের এই পর্বে দাঁড়িয়ে সে এত দিনে সব হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করেছে। তার চোখ ফেটে জল এসেছে। এতদিনে সে সত্যিকারের জমিহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। সে হ্লোভ প্রকাশ করে বলছে "কী সুখ হেই পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার দ্যাশ ফালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়!"[৯৬] আর সোনার মনে হয়েছে "সে যা কিছু ফেলে যাচ্ছে, তা আর ফিরে পাবে না। আবার এদেশে সে আসতে পারবে কবে জানে না। সে বড় হলে ঠিক চলে আসবে। কারণ যত দূরেই যাক, সে তরমুজের জমি নদীর জল, মালিনী মাছ ভুলে বেশিদিন থাকতে পারবে না কোথাও।"[৯৭]

উপন্যাসটিতে আবার সাধারণ মুসলমানের জিন্নার জন্য উচ্ছ্বাসকেও দেখিয়েছেন। পাকিস্তান নতুন স্বপ্ন ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। সদরে জিন্নাহ সাহেবকে দেখতে দলে দলে লোক যাচ্ছে। ঈশম একবার ভাবল সেও যাবে জিন্নাহকে দেখতে। এত

বড় মানুষ আসছেন, তিনি দুঃখী মানুষের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখেছেন। আলাদা দেশ করে দিয়েছেন, এবারে তোমরা বাপুরা নিজেদের মতো করেকর্মে খাও।

দেশভাগের অবধারিত পরিণাম উদ্বাস্তু জীবন। এপার বাংলায় এসে হালিশহরে প্রথমে ক্যাম্প জীবন তারপর একটুকরো মাটিতে থিতু হয়ে বসা। জীবনে যে কখনো অন্নকষ্ট ভোগ করে নি, সেই সোনা উদ্বাস্তু হয়ে অভাব কি জিনিস এত দিনে জেনে গেছে। সোনার মেজ জ্যাঠামশায়ের সংসারের প্রতি মোহ যেন কমে গেছে। শুধু বাড়ির চারপাশে নানারকমের গাছ লাগান তিনি। সোনার বাবা দু'মাস পর পর ফেরেন। বাবা বাড়ি ফিরলে তাদের ভাত খাওয়া হয়। নইলে আবার সবদিন খাবার জোটে না। কোনো কোনো দিন পেঁপে সিদ্ধ অথবা মিষ্টি কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটে।.... অথচ সোনা ভেবেছিল "এ দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, কত সমারোহ থাকবে জীবনে , দেশভাগের নিমিত্ত ওরা শহিদ হয়ে গেছে— সুতরাং সর্বত্র ওদের জন্য বিজয় পতাকা উড়বে। ওরা রাজার মতো হেঁটে হেঁটে শহর নগর পার হয়ে যাবে। "[৯৮] এদেশে এসে তাদের ভাগ্যে জুটল মনুষ্যপরিত্যক্ত এক জঙ্গল। সেখানে বনজঙ্গল সাফ করে তৈরি করা হয় মাথা গোঁজার মতো দুটি কুঁড়ে ঘর। চূড়ান্ত আর্থিক সংকটজনিত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তারা সবাই। সোনা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেহ্ণ এক কাজ বেছে নেয়— সেখানেও রয়েছে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা। জাহাজের চাকরিতে বিফ খাওয়ার কথায় সোনা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। তার যেন বলতে ইচ্ছা করে— "বিফ! আমি বিফ খাব কেন! আমি হিন্দুর ছেলে, হিন্দুস্থানে চলে এসেছি। আমি আবার বিফ খাব কেন! যারা পাকিস্তানে আছে তারা বিফ খাবে। বিফের ভয়ে আমার জ্যাঠামশাই গঙ্গার পাড়ে ঝোপজঙ্গলে বাড়ি করেছেন। .... এত কিছু হবার পর হিন্দুর ছেলে হয়ে বিফ খাবে, সে কি করে হয়! ভাবতে ভাবতে সোনা ঢোক গিলে ফেলল। সোনার এত খিদে যে বিফ মটন সব এক হয়ে যাচ্ছে তবু এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণাবোধ

সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীব্র যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। সে এবার মরে যাবে যেন... ... সে যেন চিৎকার করে বলতে চাইল "আমি সব পারি স্যার, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল ভেঙে দিতে পারি না। ভেঙে দিলে আমার আর কিছু থাকে না।"[৯৯] আর সেই মুহূর্তে আশ্চর্যভাবে সোনার সামনে মায়ের মুখ ভেসে উঠল। শীতের রাতে মা কুপি জ্বালিয়ে বাবার প্রত্যাশায় বসে আছেন। উঠোনে সেই আবহমান কালের সাদা জ্যোৎস্না। উনুনে শুধু জল সেদ্ধ হচ্ছে। বাবা এলেই দু'মুঠো অন্ন সবার পাতে। কী উদ্‌গ্রীব চোখমুখ ছোট ছোট ভাইবোনদের! সে তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে, মা আর অন্নহীন ভাইবোনের শুকনো চোখ মুখ ভেসে উঠলে , সে বলল 'আমি পারব স্যার'।[১০০] এখানে লেখক উদ্বাস্তুদের অসহায়তা, হৃদয় ও জীবন সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন।

দেশভাগ সামু ও ফতিমার জীবনকে স্পর্শ করেছে অন্যভাবে। একসময় সামু মনে করত প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মুসলিম লিগের সদস্য হওয়া। কারণ গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগরণ প্রয়োজন। হিন্দু আধিপত্যবাদের উৎখাত হওয়া দরকার। সে ধর্মের নামে রাজনীতি করে তর তর করে উপরে উঠতে থাকে। পাকাপাকিভাবে সে ঢাকা শহরের বাসিন্দা হয়ে যায়। ঠিক সেই সময়েই শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তু ছেলে সফিকুর ভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হিসাবে বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনে সফিকুরের মৃত্যু হয়। ফতিমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং তার মৃত্যুতে ফতিমা প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। ঐ সমস্ত ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে গেছে। ভাষা আন্দোলনের পর সামু উপলব্ধি করল দেশের মানুষকে তাড়িয়ে পহ্লান্তরে তারা বাঙালিকেই তাড়িয়েছে। একসময় সামুর হিন্দু-বিদ্বেষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে ফতিমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। "সে যতই হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলুক মাথার আম-জাম পাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারে নি। ফেলে দিতে

গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে।"[১০১] দেশভাগের পর হিন্দুরা দেশ ছেড়ে গেলে লিগ কর্মী হয়েও কষ্টবোধ করেছে সামু। দেশভাগের আগে সামু যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল পরে ঠিক তেমনই ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত পীড়ন বোধ করেছে। দেশ ছেড়ে মালতীরা চলে গেলে অভিমানের সঙ্গে সে ফতিমাকে বলে— "তর মালতীপিসি কী এ-দ্যাশে আছে! হিন্দুস্থানে গেছে গিয়া। সোনার দ্যাশ, সোনার সিংহাসনে রাজরানী হইয়া বইসা আছে।"[১০২]

অথচ বাস্তবে দেখি এপারে এসে অপমান, লাঞ্ছনা এবং অসম্মান মালতীর নিত্যসঙ্গী, এক গ-নিকর জীবন যাপন করে সে। বেঁচে থাকার জন্য চালের চোরাকারবারীতে পরিণত হয়েছে সে। দেশে থাকতেও মালতীর দুর্ভাগ্য কখনো তাকে পিছু ছাড়ে নি। ঢাকার রায়টে তার স্বামীর মৃত্যু হলে সে দাদার আশ্রয়ে দিন কাটাতে লাগল। সেখানেও জব্বার তার রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে শেখের কাছে বেচে দেয়, এবং তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ফলস্বরূপ সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পরে রঞ্জিত এবং ছোটনের সাহায্যে এর থেকে মুক্তি পেলেও দুর্ভাগ্যের থেকে মুক্তি ঘটেনি। এ দেশে এসে রঞ্জিতের মৃত্যু হয়েছে। আর বেঁচে থাকার জন্য মালতী পরিণত হয়েছে চাল চোরাকারবারীতে। চাল নিয়ে ফেরার পথে পুলিশের দারোগাবাবু মালতীকে ভোগ করতে চাইলে তার কণ্ঠনালী দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে সে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য সোনাবাবুর মতো তাকেও কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অপমৃত্যু ঘটছে স্বপ্নের, সংবেদনশীলতার। দেশভাগ মালতীর মতো সুকুমার মেয়েকেও হত্যাকারী করে তুলেছে। ইতিহাসের এক অভিশাপের আখ্যান এই উপন্যাস।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে সকলেরই জীবন থেকে যেন নীলকণ্ঠ পাখি হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশের মাঠ,ঘাট, আকাশ, সোনালি নদীর চর থেকেও যেন কোনো এক স্বপ্নময় দেশের ছবি— যেখানে তাদের নীলকণ্ঠ পাখিরা হারিয়ে গিয়েছিল, তারই অন্বেষণে বেরিয়েছে

সকলে। একমাত্র ঈশম শেখই যেন তার সন্ধান পেয়েছিল। তার জমি এবং আল্লা খাঁটি। তাই সে 'ঠাকুর বাড়ি'র মানুষের চলে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছে। উরাট শক্ত মাটি যেমন উর্বর করে তরমুজ ফলিয়েছে, তেমনি তার ভিতরে নীরবে বয়ে গেছে ভালোবাসা, বাংলার প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, যা তৃষ্ণার্ত মানুষকে তৃপ্তি দান করে। তাই শেষ পর্যন্ত সেই তরমুজ বনেই তার মৃত্যু হয়েছে। এবং সামু সেখানেই তার চিরবিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে, এবং সেটাই হল স্বপ্নের ভালোবাসার 'বাংলাদেশ'। এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য— "নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে"উপন্যাসের অনেক চরিত্রই কিছু পায় নি। বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখিকে ফিরে পান নি। পাননি পলিনকে। তার স্ত্রী ফিরে পান নি মণীন্দ্রনাথকে। জালালি পায়নি তার ক্ষুধার খাদ্য, বিলে ডুবে মরেছে। ফেলু রাখতে পারে নি আন্নু বিবিকে। মালতী পায় নি তার সুখকে। জোটন বিবি রাখতে পারে না কোনো স্বামীকেই। হাজি সাহেবের মাইজলা বিবি পায় না তার মনের মানুষ ফেলুকে। ঈশম শেখ রাখতে পারে না তার তরমুজ খেতকে। তবু নীলকণ্ঠ পাখির অন্বেষণে সবাই চলেছে সারা জীবন। পূর্ববঙ্গের আশ্চর্য সবুজ-নীল- মেশানো পটভূমে বিধৃত এই সুখ আর স্বপ্নের অন্বেষণ দেশকাল আলিঙ্গিত কাহিনিতে রূপায়িত হয়েছে। আঠারো বছর সময় সীমার মধ্যে এই বাংলাদেশে কত না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ঘটনার তরঙ্গ! সেই সব তরঙ্গের অভিঘাত শীতলক্ষ্যা নদীতীরবর্তী গ্রামের মানুষ কীভাবে বিচলিত, বিপর্যস্ত হয় ও সেই বিপর্যয়ের মধ্যেই কীভাবে এক অমল সুখের স্বপ্ন দেখে, তার উজ্জ্বল চিত্রশালা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে।'[১০৩]

অমল সুখের এক সৌহার্দ্যময় সামাজিক পরিসরে যে প্রীতি বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল, ধর্মাচরণ সমান্তরাল রাস্তায় পরস্পরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চললেও হিন্দুতে মুসলমানে ছিল প্রীতির সম্পর্ক। এই প্রীতিই বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল সুর, বাঙালির হাজার বছরের

পরম্পরা। বিশ শতকে ধর্ম যখন রাজনৈতিক বৈরিতার উপাদান হয়ে উঠল, তখন বারবার বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্যে কৃষহ্লপহ্ল সূচিত হয়েছে। যে কৃষহ্লপহ্লের প্রলম্বিত ছায়া আজও বাঙালির ভুবনে যন্ত্রণা, অবিশ্বাস ও হানাহানির কৃষহ্লবিবর রচনা করে চলেছে, তার নাম হতে পারে দেশভাগ।

দেশভাগের সময়কার দ্বিজাতিতত্ত্ব ও জাতীয় অভিজ্ঞতার যতটা গভীরভাবে খোদাই হয়ে আছে পশ্চিম ভারতের প্রেহ্লিতে রচিত পাঞ্জাবি ও উর্দু সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যে সে তুলনায় নীরবতাই লহ্ল করেছেন আলোচকেরা।[১০৪] হয়ত ধর্মীয় হানাহানির বীভৎসতা, সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বীভৎসতা খানিকটা চাপা দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যে, তথাপি দু দশক পেরিয়ে যাওয়ার পর যারা কলম ধরেছেন তাদের কেউ কেউ অনেকটা নিরপেহ্ল ভাবেই ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে উপস্থাপিত করেছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে গেছেন যে সব হিন্দুরা, স্বভাবতই তাদের লেখায় চল্লিশের দশকের পূর্ববঙ্গের সামাজিক বাস্তব এবং রাজনৈতিক টেনশন অনেকটাই উঠে এসেছে ইতিহাসসম্মত ভাবে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' কিংবা 'কেয়াপাতার নৌকো'য় পূর্ববঙ্গের জনজীবনে সম্প্রীতির সূত্রচ্ছিন্ন হবার অর্থনৈতিক প্রেহ্লিত হিসাবে চাষযোগ্য ভূমির উপর বর্নহিন্দুদের নিয়ন্ত্রণ এবং মুসলমানদের রায়ত অথবা কৃষি মজুরের ভূমিকা এবং তাদের প্রান্তিকায়িত অবস্থার ইঙ্গিত আছে। অন্যদিকে খুব স্পষ্ট না হলেও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্বের দ্বিধা দুর্বলতা, নেতৃত্বের বিরোধ, হ্লমতালোভী মুসলমান ধনিক অংশের ভূমিকা অস্পষ্টভাবে হলেও উঠে এসেছে। তবে রাজনৈতিক পরিপ্রেহ্লিতের বিশে-ষণের চাইতে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণার কথকতাই বাংলার দেশভাগ সাহিত্যে বিশেষ করে উঠে এসেছে। আমাদের আলোচিত উপন্যাস দুটিও এই পর্যবেহ্লণকে পুষ্ট করে।

বিশশতকের চল্লিশের দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা '৪৭ এর দেশভাগ। এই

দেশভাগের মানসিক প্রস্তুতি একটু একটু করে দানা বাঁধছিল বঙ্গভঙ্গের পর্ব থেকেই। নানান রাজনৈতিক ঘটনায় এই পরিস্থিতি তীব্রতর হচ্ছিল, তা শীর্ষবিন্দুতে পৌছাঁয় ১৯৪৬ এর কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের দাঙ্গায়। স্বাধীনতার প্রসববেদনা শুরু হয়েছিল দাঙ্গা দিয়ে। বাংলা কথাসাহিত্যে '৪৬ এর দাঙ্গার টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে ছবিই শুধু নয়, তা ধারণ করে আছে বহ্নিমান সময়টিকেই। দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু জীবনযন্ত্রণাকে আধেয় করে লেখা আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসদুটিও ১৯৪৬— ১৯৫০ পর্বের বাংলার সমাজ রাজনীতির পর্বান্তরের ইতিহাসেরই কথকতা যেন। বস্তুত চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহের ঔপন্যাসিকরণের মধ্যে দিয়ে বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠেছে দহনকালের কথামালা।

উল্লেখপঞ্জি ঃ-

(১) লাডলী মোহন রায়চৌধুরী ঃ হুমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগ ঃ সূত্রটি নেওয়া হয়েছে চন্দন কুমার কুণ্ডুর 'চল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ' কলকাতা, ২০১২, গ্রন্থটি থেকে, পৃ. ৬৫।

(২) ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫।

(৩) Tomar J.K. : 'History of Modern India' New Delhi, 2007, p. 205.

(৪) উদ্ধৃত, কুণ্ডু চন্দন কুমার ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

(৫) উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৩৮।

(৬) উদ্ধৃত, বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ ঃ ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৬।

(৭) ঐ, পৃ. ৪৮।

(৮) Sarkar Sumit : Modern India, Macmillan 1983, p. 434.

(৯) ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু ঃ কথা শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৮।

(১০) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক ঃ স্বাধীনতার স্বাদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৯।

(১১) ঐ, পৃ. ১৫।

(১২) ঐ, পৃ. ১৫।

(১৩) ঐ, পৃ. ১৮।

(১৪) ঐ, পৃ. ১৮।

(১৫) ঐ, পৃ. ২২।

(১৬) ঐ, পৃ. ২৯।

(১৭) ঐ, পৃ. ৩০।

(১৮) ঐ, পৃ. ৩৭।

(১৯) ঐ, পৃ. ৪৩।

(২০) ঐ, পৃ. ৫৩।

(২১) ঐ পৃ. ৫৬।

(২২) ঐ, পৃ. ৫৭।

(২৩) ঐ, পৃ. ৫৭।

(২৪) ঐ, পৃ. ৫৮।

(২৫) ঐ, পৃ. ৬১।

(২৬) ঐ, পৃ. ৬৩।

(২৭) ঐ, পৃ. ৬৩।

(২৮) ঐ, পৃ. ৬৪।

(২৯) ঐ, পৃ. ৬৫।

(৩০) ঐ, পৃ. ৭৮।

(৩১) ঐ, পৃ. ৭৮।

(৩২) ঐ, প. ১১০।

(৩৩) ঐ, পৃ. ১১২।

(৩৪) ঐ, পৃ. ১১৪।

(৩৫) ঐ, পৃ. ১১৩।

(৩৬) ঐ, পৃ. ১১৪।

(৩৭) ঐ, পৃ. ১১৫।

(৩৮) ঐ, পৃ. ১২৮।

(৩৯) ঐ, পৃ. ১২৯।

(৪০) ঐ, পৃ. ১৩১।

(৪১) ঐ, পৃ. ১৩২।

(৪২) ঐ, পৃ. ১৩২।

(৪৩) ঐ, পৃ. ১৬১।

(৪৪) ঐ, পৃ. ১৬৪।

(৪৫) ঐ, পৃ. ৬৪।

(৪৬) রায় প্রফুল্ল ঃ কেয়াপাতার নৌকো, কলকাতা ২০০৩, পৃ. ২৩।

(৪৭) ঐ, পৃ. ২৪৮।

(৪৮) ঐ, পৃ. ২৫১।

(৪৯) ঐ, পৃ. ৪৯।

(৫০) ঐ, পৃ. ২১৪।

(৫১) ঐ, পৃ. ২২৪।

(৫২) ঐ, পৃ. ৩০২।

(৫৩) ঐ, পৃ. ৪১২।

(৫৪) ঐ, পৃ. ৪০২।

(৫৫) ঐ, পৃ. ৪০৫।

(৫৬) ঐ, পৃ. ৪০৪।

(৫৭) ঐ, পৃ. ৪০৩।

(৫৮) ঐ, পৃ. ৪০৩।

(৫৯) ঐ, পৃ. ৪১৮।

(৬০) ঐ, পৃ. ৪৮৩।

(৬১) ঐ, পৃ. ৪৫১।

(৬২) ঐ, পৃ. ৪৯৫।

(৬৩) Choudhuri Pranati : A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlements within the C.M.D., Kolkata, 1983, p. 4.

(৬৪) Chakrabarti Prafulla Kumar : The Marginal Man, Kolkata, 1990, p. 2.

(৬৫) উদ্ধৃত, সাক্সেনা আর এন ঃ Refugee : A Study in changing Attitude, Bombay, 1961, p. 4, প্রবন্ধে।

(৬৬) রায় প্রফুল্ল ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।

(৬৭) ঐ, পৃ. ৫৭২।

(৬৮) ঐ, পৃ. ৬০২।

(৬৯) ঐ, পৃ. ৫৭৮।

(৭০) ঐ, পৃ. ৫৭৫।

(৭১) ঐ, পৃ. ৪১৪।

(৭২) মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার ঃ কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭০।

(৭৩) বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ্ময় ঃ উদ্বাস্তু, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৪।

(৭৪) বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন ঃ 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৯।

(৭৫) ঐ, পৃ. ১৭।

(৭৬) ঐ, পৃ. ১৯।

(৭৭) ঐ, পৃ. ১৯।

(৭৮) ঐ, পৃ. ১৯।

(৭৯) ঐ, পৃ. ২৩।

(৮০) ঐ, পৃ. ৩৩।

(৮১) ঐ, পৃ. ৩০।

(৮২) ঐ, পৃ. ৪০।

(৮৩) ঐ, পৃ. ৮০।

(৮৪) ঐ, পৃ. ৯২।

(৮৫) ঐ, পৃ. ৯৯।

(৮৬) ঐ, পৃ. ২৪৬।

(৮৭) ঐ, পৃ. ২৯৮।

(৮৮) ঐ, পৃ. ২৩৫।

(৮৯) ঐ, পৃ. ২৯৬।

(৯০) ঐ, পৃ. ২৯৬।

(৯১) ঐ, পৃ. ২৯০-২৯১।

(৯২) ঐ, পৃ. ২৯১।

(৯৩) ঐ, পৃ. ৩৬১।

(৯৪) ঐ, পৃ. ৩৬৩।

(৯৫) ঐ, পৃ. ৩৬৩।

(৯৬) ঐ, পৃ. ৩৬৭।

(৯৭) ঐ, পৃ. ৩৬৬।

(৯৮) ঐ, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

(৯৯) ঐ, পৃ. ৩৯১।

(১০০) ঐ, পৃ. ৩৯১।

(১০১) ঐ, পৃ. ৩৯৩।

(১০২) ঐ, পৃ. ৩৭২।

(১০৩) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার ঃ কালর প্রতিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

(১০৪) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ অশ্রু কুমার শিকদার ঃ ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৩-২৯।